Vol. 27 | No. 1 | 1983

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ছন্দশাস্ত্রের স্থপতি : প্রবোধচন্দ্র

Volume	27
Issue	1
Year	1983
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবদুল কাদির
Published online	December 1, 1983
DOI	10.62328/sp.v27i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v27i1.2
Pages	127-156
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা ছন্দশাস্ত্রের স্থপতি: প্রবোধচন্দ্র

আবদুল কাদির

ধ্বনিভিত্তির নিরিখে ছন্দের প্রকৃতি নিরূপিত হয়ে থাকে; তাই ছন্দকে বলা হয় ধ্বনিশিল্প। কাব্যভাবের সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করে ছন্দোভঙ্গীর সহায়তায়,—বিচিত্র ছন্দের পাখায় ভর ক'রেই মানুষের রস-পিয়াসী চিত্তের অনায়াস বিহার ঘটে অনির্বচনীয় আনন্দলোকে। ছন্দ কাব্যভাবকে করে গতিশীল, তাকে দান করে সঙ্গীতময়তা। তারই ফলে কাব্যভাবের ব্যঞ্জনা শব্দপিণ্ডের জড়ত্ব অতিক্রম ক'রে হয় রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ। গোবিন্দদাস কবিরাজের:

৬	৭	৬	২
ঢল ঢল কাঁচা	অঙ্গের লাবণি	অবনী বহিয়া	যায়।
ঈষৎ হাসির	তরঙ্গ-হিলোলে	মদন মূরছা	পায়॥

এই শ্লোকটির প্রতি পঙ্‌ক্তিতে মাত্রার হিসাবে আছে ৬+৭+৬+২ ব্যষ্টি, এবং অক্ষরের হিসাবে আছে ৬+৬+৬+২ ব্যষ্টি। সুতরাং মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত এই দুই রীতিতেই এর ধ্বনিসাম্য সিদ্ধ। এর অসমপদী তাল শ্রুতিতে আনন্দরস পরিবেশনে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতার হেতু হয়নি; বরঞ্চ নিখুঁত ছন্দের স্পন্দন এর উত্তরণ ঘটিয়েছে একাল অবধি।

বাল্যকালে শুনেছিলাম এক বৈরাগী ও বোষ্টমীর দ্বৈতকণ্ঠে একতারা ও খোল-করতাল বাজিয়ে এই বৈষ্ণবীয় পদগীতি:

কামনা করিয়া সাগরে ডুবিব, সাধিব প্রাণের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন, তোমারে করিব রাধা॥

তারা 'শ্রীনন্দের নন্দন' পদটিতে নানা ভাবে সুরবৈচিত্র্য প্রয়োগ ক'রে একটা মায়াজালের সৃষ্টি করেছিল; তাতে মাত্রার আধিক্য উপস্থিত শ্রোতাদের রস-চেতনাকে করেছিল অভিভূত। বাঙলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যে মাত্রার এরূপ আধিক্য অথবা ন্যূনতা বিস্তর বিদ্যমান; ছন্দধ্বনির সে-সকল অসমতা সুরের সহযোগে পুষিয়ে নেওয়াই ছিল তৎকালীন রেওয়াজ। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ সেই সূত্র ধ'রেই সাঙ্গীতিক তত্ত্বের (musical theory) দ্বারা বাংলা কবিতার ছন্দরীতি নির্ধারণ করেন সমপদী, অসমপদী ও বিষমপদী এই তিন ধারায়।[১] তিনি বলেন:

> "কাব্যে ছন্দের যে-কাজ, গানে তালের সেই কাজ।...কবিতায় যেটা ছন্দ, সঙ্গীতে সেইটেই লয়।"[২]

সঙ্গীতের স্বরলিপি (musical notation) বা শ্রুতিবিজ্ঞানের ধ্বনিচিত্র কবিতার ছন্দনির্ণয়ে কোথাও কোথাও কতখানি সহায়ক হ'তে পারে তা বিচার-সাপেক্ষ। শ্রুতিতত্ত্বানুগ ছন্দোবিধি (acoustical metrics) উদ্ভাবনের উপায় এদেশে এখনও হয়নি। তবে "গানের ছন্দের সঙ্গে কাব্যের ছন্দের সাদৃশ্য কোথায় ও পার্থক্য কোথায় এ-বিষয়ে" আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন বিস্তারিতরূপে পর্যালোচনার পর বলেছেন:

> "কাব্যের ছন্দ ও গানের ছন্দ কোনো কোনো বিষয়ে সদৃশধর্মা বটে, কিন্তু সমান-ধর্মা নয়। যে-ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে সেখানেও তাদের গতি এক-দিকে নয়, এ সাদৃশ্যটাও বিভিন্নমুখ। এ দু'য়েরই যা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য বা স্বতন্ত্র সার্থকতা, তা সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে এ দু'য়ের ভিতরকার স্বরূপ বা সৌন্দর্যমূর্তিকে আকৃতি দান করে। অতএব কাব্য ও সঙ্গীতের ছন্দের যথার্থ পরিচয় লাভ করতে হলে এই দুই শাস্ত্রের স্বতন্ত্র আলোচনা করা আবশ্যক।"[৩]

তৎপূর্বে ১৩২৯ পৌষ-ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে 'ছন্দের শ্রেণীবিভাগ' শীর্ষনামে তিনি যে দু'টি সারবান প্রবন্ধ লেখেন, তাতে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, প্রবোধচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যে গ্রাফিক প্রসডির সিদ্ধকাম প্রতিষ্ঠাতা; ইংরেজী ছন্দ-সাহিত্যে জর্জ সেইণ্টস্‌বারীর যে-সম্মানিত স্থান বাঙলা ছন্দ-সাহিত্যে প্রবোধচন্দ্র সেই সমুচ্চ স্থানের অবিসংবাদিত অধিকারী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শশাঙ্কমোহন সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রাখালরাজ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু পণ্ডিত-ব্যক্তি বাঙলা ছন্দ বিষয়ে ইতোপূর্বে অনেক আলোকপাত করেন; কিন্তু বাঙলা ভাষার প্রধান ছন্দ অক্ষরবৃত্তের ধ্বনিভিত্তি নির্দেশ কারও পক্ষেই সম্ভবপর হয়নি; ফলে বাঙলা ছন্দশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত ও সম্পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পথে অগ্রসর হ'তে পারেনি। বাঙলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিভিত্তি সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্রই সর্বপ্রথম বলেন:

> "অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূলে একটি ধ্বনিতত্ত্ব আছে; সেই তত্ত্বটি এই যে, অক্ষর-বৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দ শেষাংশে মাত্রাবৃত্তধর্মী ও অন্যাংশে স্বরবৃত্ত-ধর্মী।"[৪]

তিনি অন্যত্র বলেন:

> "এ-ছন্দে শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে ধরা হয় এক, কিন্তু শব্দের অন্ত্যস্থিত যুগ্মধ্বনিকে ধরা হয় দুই।"[৫]

তিনি তাঁর 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' পুস্তিকায় (৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮) বলেন:

> "এ-ছন্দের স্বরূপ এই যে, এর প্রত্যেক শব্দের শেষ অংশের (সিলেবল্-এর) প্রকৃতি মাত্রিক (quantitative) এবং বাকি অংশের প্রকৃতি স্বরসংখ্যক

(syllabic)। একস্বর শব্দের ধ্বনিটিকে প্রান্তিক বলেই গ্রহণ করতে হয় সুতরাং এ-প্রকার শব্দের ধ্বনিটিও মাত্রিক প্রকৃতির।"

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সার কথা এই যে, তার শব্দের আদি ও মধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি (Clsoed syllable) সচরাচর এক কলা (unit) এবং অবস্থা বিশেষে বিকল্পে দুই কলা হয়ে থাকে; কিন্তু তার প্রান্তস্থিত যুগ্মধ্বনি এবং অলগ্ন যুগ্মধ্বনি সর্বদা ও সর্বথা দুই কলা, সেখানে বৈকল্পিকতা অচল। অক্ষরবৃত্তে শব্দমধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি কোন্ কোন্ অবস্থায় দ্বৈব্যষ্টিক মর্যাদা পেতে পারে, সে-বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র বলেন:

"(১) সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে কখনও টেনে বাড়ানো হয় না। (২) সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রথম পদের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে বিকল্পে বাড়ানো কমানো যায়। (৩) অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে বিকল্পে টেনে বাড়ানো কিংবা ঠেসে কমানো যায়। (৪) অ-সংস্কৃত প্রত্যয় পরে থাকলে শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে সাধারণতঃ টেনে বাড়ানোই হয় এবং ইচ্ছা করলে ঠেসে কমানোও যায়।"৬

উপরোক্ত প্রথম সূত্রটি সম্বন্ধে তিনি উপরন্তু বলেছেন: "সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিটিকে টেনে দীর্ঘ না করাই এ-ছন্দের রীতি।"...পরে পুনরায় বলেছেন: "খাঁটি সংস্কৃত (অ-সমাসবদ্ধ) শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে টেনে দীর্ঘ না করাই সঙ্গত।" অথচ রবীন্দ্রনাথ তা করেছেন; যথা:

বড় বড় মস্তকের পাকা শস্যক্ষেত
বাতাসে দুলিছে যেন 'শীর্ষ'-সমেত।
—(সোনার তরী, হিং টিং ছট্)

কোথায় লুকায়ে থাকে, কী বলে সে বুঝিতে কে পারে;
'যুগান্তরের' ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল;
—(পূরবী, অতীত কাল)

আসে 'অবগুণ্ঠিতা' প্রভাতের অরুণ দুকূলে
শৈল তট-মূলে
আত্মদান-অর্ঘ্য আনে পায়;
তপস্বীর ধ্যান ভেঙে যায়।
—(বীথিকা, মেঘমালা)

ডালিতে এনেছ ফুল স্মৃত—'বিস্মৃত'
কিছু-বা অপরিচিত।

হে দূতী, এনেছ আজ গন্ধে তব যে ঋতুর বাণী
নাম তার নাহি জানি।
—(সানাই, শেষ অভিসার)

গুরু গুরু 'গর্জন' গুন্ গুন্ স্বর
দিন রাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
—(আরোগ্য : ১০)

পুঁথির প্রথম শূন্য পাতে
'অলংকরণ,' আঁকা, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কী লেখা,
বাকি সব আঁকাবাঁকা রেখা।
—(জন্মদিনে : ১৯)

উৎকলিত উদাহরণগুলিতে 'শীর্ষ', 'যুগান্তরের', 'অবগুণ্ঠিতা', 'বিস্মৃত', 'গর্জন' ও 'অলংকরণ' প্রভৃতি খাঁটি অ-সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি যথাক্রমে 'শীর' 'গান', 'গুন্', 'বিস্', 'গর্' ও 'লং' দ্বৈব্যষ্টিক ব'লে গণ্য হয়ে ছন্দকে নিয়মিত (modulate) করেছে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র অদ্ব্যর্থভাষায় বলেছেন: "সংস্কৃত অ-সমাসবদ্ধ শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি যৌগিক (অক্ষরবৃত্ত) ছন্দে সর্বত্রই এক unit বলে গণ্য হ'য়ে থাকে, এই আমার প্রধান বক্তব্য এবং এ-নিয়মের ব্যতিক্রমকেই আমি **যথার্থ ব্যতিক্রম** ব'লে মনে করি। ···'এগুলি ব্যতিক্রম বা আর্ষপ্রয়োগ ব'লে গণ্য অর্থাৎ সাধারণ লেখকের রচনায় এ-গুলিকে সাধু ব'লে গণ্য করা হবে না।"[৭] অথচ এ-প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায় এক পত্রে আমাকে লেখেন যে, রবীন্দ্রনাথের 'যুগান্তরের ব্যথা' পদের অনুসরণে দিলীপকুমারের 'অনামী' কাব্যের 'বৈরাগী' কবিতায় লেখা : 'রূপান্তরিত কান্তি' পদ "প্রবোধচন্দ্র সমর্থন করেছেন।"[৮]

বাঙলার তিন মূল ছন্দের মধ্যে মাত্রাবৃত্ত স্থিরমাত্রক ছন্দ; তাতে ধ্বনির মাত্রামূল্য কুত্রাপি পরিবর্তিত হয়না। কিন্তু স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত অস্থিরমাত্রক; এই দুই ছন্দ-রীতিতে ব্যতিক্রম বা আর্ষপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্বরবৃত্তের পূর্ণপর্ব সাধারণতঃ চতুঃস্বরিক (tetrasyllabic)। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

শঙ্করা—খেমটা ॥

এখন কি আর নাগর তোমার আমার প্রতি সে মন আছে।
নূতন পেয়ে পুরাতনে তোমার সে যতন গিয়েছে ॥
তখনকার ভাব থাকতো যদি
তোমায় পেতেম নিরবধি;
এখন, ওহে গুণনিধি,
আমায় বিধি বাম হয়েছে।

যা হবার তা আমার হবে,
তুমি তো হে সুখে র'বে ;
বলো দেখি, শুনি তবে
　　　কোন্ নতুনে মন মজেছে ॥
　　　　——(মধুসূদন দত্ত ; একেই কি বলে সভ্যতা ? ২/১)

এখানে প্রতিটি পর্ব চতুঃস্বরিক। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে "তোমার সে যতন গিয়েছে" পদে 'যতন' শব্দের 'য' অক্ষরের পরে অস্থানে যতিখণ্ডন ক'রে পর্বদ্বয় পরিমিত হয়েছে।

কিন্তু স্বরবৃত্তের পূর্ণপর্ব ত্রিস্বরিক (trisyllabic) হওয়ার নজির রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' কাব্যের 'নিষ্কৃতি' শীর্ষক কবিতাটি থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করছি :

মা বললে, 'কেন, ওই যে চাটুজ্জেদের পুলিন,
　　　　নাই-বা হ'লো কুলীন,…
বাপ বল্‌লে, 'থামো !
আরে আরে রামোঃ !…'
বাপ বললেন কঠিন হেসে,' 'তোমরা মায়ে-ঝিয়ে
এক লগ্নেই বিয়ে কোরো আমার মরার পরে ;
　　　সেই ক'টা দিন থাকো ধৈর্য ধ'রে।'

এখানে 'মা বল্‌লে' পর্বে তিন-স্বর (syllable) চার-মাত্রা (mora) ; 'বাপ বল্‌লে' পর্বে তিন-স্বর পাঁচ-মাত্রা, এবং 'বাপ বল্‌লেন' ও 'এক লগ্নেই' এ-দু'টি পর্বের প্রত্যেকটিতে তিন-স্বর ছয়-মাত্রা হিসেবে রয়েছে। এরূপ ভঙ্গিবৈচিত্র্য (variance) বা প্রতিকল্পন (substitution) আধুনিক স্বরবৃত্ত কবিতায় অপ্রতুল নয়।

একদা প্রবোধচন্দ্র বলেছিলেন : "চৌদ্দ স্বরের স্বরবৃত্ত ছন্দের বিকৃতি থেকে চৌদ্দ অক্ষরের অক্ষরবৃত্ত পয়ারের উৎপত্তি হয়েছে।… অক্ষরবৃত্ত যে স্বরবৃত্তের ব্যতিক্রম থেকেই উৎপন্ন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।"[৯] বাঙলা ভাষার আদিম ও স্বাভাবিক ছন্দ স্বরবৃত্ত এবং আদিকালের প্রত্ন-স্বরবৃত্তে ব্যতিক্রমের বহুলতা তার বৈশিষ্ট্য। এহেন স্বরবৃত্তের বিকৃতি থেকে যে-অক্ষরবৃত্তের উৎপত্তি, তাতে ধ্বনির মাত্রামূল্যের বৈলক্ষণ্য (Variation) ও হ্রাস-বৃদ্ধি (modulation) অপরিহার্য হবে, এটা অস্বাভাবিক নয়। অক্ষরবৃত্তের এই স্বভাবই তাকে করেছে গদ্যাত্মক ও স্থিতিস্থাপক (elastic), তা'তে সঞ্চার করেছে দার্ঢ্য ও গাম্ভীর্য, তার গতিকে করেছে মন্থর অথচ তানময়। এ-ছন্দ যুক্তাক্ষর ও রুদ্ধধ্বনির বহুল ব্যবহারে তরঙ্গিত হয়ে ওঠে,—সৃষ্টি হয় স্বরকম্পন।

কিন্তু অক্ষরবৃত্তের একটি পর্বে উপর্যুপরি কয়টি সংবৃত বদ্ধধ্বনি সংস্থাপিত হলে তাতে সুষম ছন্দোস্পন্দের সৃষ্টি হয়, তা বিচার্য। প্রবোধচন্দ্র বলেন : "যৌগিক ছন্দের

(অক্ষরবৃত্তের) একই পর্বে বা একই শব্দে তিনটি সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি অনায়াসেই স্থাপন করা যায়।'' ১০ প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথ থেকে দৃষ্টান্ত তুলছি :

উচ্চকণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর। চারিদিকে 'ক্ষিপ্তোন্মত্ত' জল
আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে।
—(কথা, দেবতার গ্রাস)

সর্বসুখ, সর্বসঙ্গ, সর্বৈশ্বর্যময়
সকল সান্ত্বনা একা, সকল আশ্রয়,
—(কাহিনী, গান্ধারীর আবেদন)

মুহূর্তের 'নৃত্যচ্ছন্দে' ক্ষণিকের দল
যাক পথে মত্ত হয়ে বাজায়ে মাদল।
—(পূরবী, উৎসবের দিন)

পদাঘাতে জীর্ণ তা'রে নাহি করে দণ্ডপলগুলি,
'সর্বস্বান্ত' নাহি করে পথপ্রান্তে ধূলি।
—(পূরবী, কঙ্কাল)

এ বিশ্ব তো তারি কাব্য, 'মন্দাক্রান্তে' তারি রচে টীকা—
বিরাট দুঃখের পটে আনন্দের সুদূর ভূমিকা।
—(সানাই, যক্ষঃ)

এখানে 'ক্ষিপ্তোন্মত্ত', 'সর্বৈশ্বর্য', 'নৃত্যচ্ছন্দে,' 'সর্বস্বান্ত' ও 'মন্দাক্রান্তে' পর্বে পর-পর তিনটি ক'রে সংশ্লিষ্ট বদ্ধধ্বনি প্রযুক্ত হয়েছে; তাতে অক্ষরবৃত্তের পদ্ধতি প্রনষ্ট না হ'লেও ধ্বনিমাধুর্যের (melody) কিছু হানি ঘটেছে কি না, সেটাই প্রধান প্রশ্ন। প্রবোধচন্দ্র বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যের 'তপোভঙ্গ' কবিতার 'বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে' পঙ্‌ক্তিটি 'বিদ্যুৎবহ্নি সর্প-সম হানে ফণা যুগান্তের মেঘে' রূপে লেখা ''হলেও ছন্দের নীতি নষ্ট হবে না।'' তিনি আরও বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যের 'বর্ষশেষ' কবিতার—

বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখী।

এর প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ''বিদ্যুৎদীর্ণ মহাশূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়'' রূপে লেখা ''হলেও যৌগিক ছন্দের (অক্ষরবৃত্তের) রীতি লঙ্ঘিত হ'তো না।''১১ প্রবোধচন্দ্রের এরূপ

প্রবোধ-বাক্যে প্রবুদ্ধ হ'য়ে কোনো অর্বাচীন কবি যদি লেখেন :

বিদ্যুদ্দীর্ণ শূন্যপথে আতঙ্কিয়া বজ্রের নির্ঘোষে
ওড়ে ত্রস্ত পাখী।

তা হ'লে অক্ষরবৃত্তের পদ্ধতি অপহৃত না হলেও তাতে ছন্দস্পন্দন (rhythm) বিঘ্নিত হয় কি না, সেটিই আসল বিবেচ্য-বিষয়।এটা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শ্রুতিধর ও অসাধারণ প্রতিভাধর কবির হাতে বিরচিত এরূপ শব্দনিচয় কদাপি শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষে পীড়াদায়ক হতেই পারেনা। এ-প্রসঙ্গে অপর চারজন প্রসিদ্ধ কবির রচনা থেকে চারটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি :

রাবণের আজ্ঞা যদি 'বিদ্যুৎজিহ্বা' পায়।
শ্রীরামের 'মস্তকসজ্জ' করিবারে যায়।।
—(কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড)[১২]

'ষট্‌সন্দর্ভে' কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্ব প্রকাশিল।
চারি লক্ষ গ্রন্থ দোঁহে বিস্তার করিল।।
—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

উদিছেন ঐ 'কৌরববংশ'—আদি যিনি
নিশানাথ। দুর্যোধনে ভূশয্যায় হেরি'
কুবরণ হইলা কি শোকে সুধানিধি ?
(মধুসূদন দত্ত, মহাভারতীয় ঘটনা-অবলম্বনে)

অত্যদ্ভুত 'প্রত্যুৎপন্ন'মতিত্ব-সহিত
পশ্চাদ্দ্বার দিয়া, নৌকারূঢ়, পলায়িত,
—(দ্বিজেন্দ্রলাল, মন্ত্র, নবদ্বীপ)

উপরোদ্ধৃত 'বিদ্যুৎজিহ্বা', 'মস্তকসজ্জ', 'ষট্‌সন্দর্ভে', 'কৌরববংশ' ও 'প্রত্যুৎপন্ন',—এই পাঁচটি শব্দের প্রত্যেকটি চতুরক্ষর বা চতুকল ব'লে গণ্য এবং প্রত্যেকটিতে উপর্যুপরি তিনটি রুদ্ধধ্বনির পরে একটি মুক্তধ্বনি রয়েছে। শব্দের এই ধ্বনিবিন্যাস লাতিন Epiritus Quartus রীতির বাঙলা আক্ষরিক প্রতিরূপ। আরব-ইরাণের ছন্দ হজয্, রমল্ ও রযজ্ যথাক্রমে লাতিন Epiritus Primus, Epiritus Secundus ও Epiritus Tertius অনন্যরূপ; কিন্তু আরব-ইরাণের ছন্দে Epiritus Quartus রীতির কোনো প্রতিরূপ নেই।[১৩] সুতরাং সঙ্গতভাবেই বলা চলে যে, আলোচ্য শব্দগুলি কানে কিছু রূঢ় ঠেকে কি না, অথবা কতখানি শ্রুতিসুখকর, সে-বিষয় বিশেষজ্ঞদের বিবেচনা-সাপেক্ষ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'চারের ঘরানা ছন্দ' স্বরবৃত্তের ধ্বনিবিচার প্রসঙ্গে বলেন যে, তাতে "খাওয়া চাওয়া পাওয়া প্রভৃতির 'ওয়া' দুই না ধ'রে এক ধরতে হয়, কারণ ওটা অন্তঃস্থ

ব-এর সামিল; তারপর বাজিয়ে সাজিয়ে প্রভৃতির 'ইয়ে' পঙ্‌ক্তি পর্বের পূর্বার্ধে থাকলে এক এবং শেষার্ধে থাকলে দুই হ'বে, যেমন—'বাজিয়ে যাব মল'; কিন্তু ঐটে উল্টে 'যাব বাজিয়ে মল' লিখলে ছন্দ হবে না; কারণ 'ইয়ে' এখানে দু'মাত্রা।"[১৪] প্রবোধচন্দ্র তাঁর 'ছন্দ-পরিক্রমা' পুস্তকের প্রথম সংস্করণের 'বাংলা ছন্দে অন্তঃস্থ য় ও অন্তঃস্থ ব-এর প্রচ্ছন্ন রূপ' অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় সংস্করণের 'ছন্দ-মীমাংসা : দলবৃত্ত রীতিতে পঞ্চদল পর্ব চলে কি' অধ্যায়ে এই বিতর্কিত বিষয়ে বিস্তারিত পর্যেষণা করেছেন। এ-প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি:

মায়া কাটিয়ে চলে সে তো গেছে এখান থেকে;
তোকে যাদু আমার কাছে রেখে।
—(দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, 'মাতৃহারা')

মাঝে মাঝে বাতাস লাগ্‌ছে আসি।
কেবল দূরে অতি দূরে
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মেঠো সুরে,
ওঠ্‌ছে কোন্ এক হতভাগ্যের বাঁশী।
—(ঐ, ঐ, 'বিধবা')

জবান দেখি যে বড় বে-দুরস্ত—হয়েছিস্ দেওয়ানা?
মুণ্ড কাহার জানিতে চাহিনা, ধুইলেই যাবে জানা।
—(মোহিতলাল, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব')

লাগ্ লাগ্ ওরে লেগে যায়
এর ঢাল ওর তরোয়াল।
ভোট-কুড়ুনিরা কেড়ে নেয়
ঘুঁটে কুড়েনির দেওয়াল।

উপরোদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্তের 'মায়া কাটিয়ে' ঠিক 'যাব বাজিয়ে' পর্বের অনুরূপ; সুতরাং এতে পাঁচ সিলেবল হওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিচারে ছন্দঃস্রংসন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের 'পরিশেষ' কাব্যের 'স্পাই' কবিতার "লুকিয়ে লুকিয়ে কী যে লেখে, হয়ত-বা সে কবি" পঙ্‌ক্তিটিতে 'লুকিয়ে' শব্দে 'পর্বাস্তস্থিত ধ্বনির উচ্চারণ দ্রুত ও সংশ্লিষ্ট' হয়ে প্রবোধ-চন্দ্রের বিচারে ছাড়পত্র পেলে 'ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে' পর্বটিও সেই সুবিধা (concession) পাবে। প্রবোধচন্দ্র বলেছেন: "অন্তঃস্থ-ব ধ্বনি সব রীতির ছন্দেই সর্বদাই 'কাজ ক'রে যায় গোপনে গোপনে।"[১৫] উপরোদ্ধৃত তৃতীয় ও চতুর্থ দৃষ্টান্তে যথাক্রমে 'দেওয়ানা' ও 'দেওয়াল' শব্দে 'ওয়া' ধ্বনিটি একমাত্রক না দ্বিমাত্রক, তা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

প্রবোধচন্দ্র তাঁর 'ছন্দ-পরিক্রমা' দ্বিতীয় সংস্করণের সপ্তম অধ্যায়ে 'মূঢ়, রূঢ়, গূঢ়' শব্দের ব্যতিক্রান্ত ধ্বনিমূল্য সম্বন্ধে সারগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পর্যালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ

'রূঢ়' ও 'মূঢ়' শব্দ মাত্রাবৃত্তে সর্বত্র ত্রিমাত্রক রূপে প্রয়োগ করেছেন; কিন্তু অক্ষরবৃত্তের 'গূঢ়' 'মূঢ়' তাঁর রচনায় দ্ব্যক্ষর রূপেই পরিগণিত। যথা :

কাহার নূপুর-শিঞ্জিত পদ সহসা বাজিল বক্ষে ?...
'রূঢ়' দীপের আলোক লাগিল ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে।
—(কথা, 'অভিসার')

তীব্র ব্যথায় মর্ম চিরিয়া, ওগো সুন্দর চোর!
যুগে যুগে তা'রা কাঁদিয়া মরিছে 'মূঢ়' আবেগে ভোর।
—(কল্পনা, 'চৌর-পঞ্চাশিকা')

পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ় ফণা।
—(বলাকা : ৪৫)

জাগিয়াছে দুর্যোধন। 'মূঢ়' ভাগ্যহীন,
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দিন।
—(কাহিনী, 'গান্ধারীর আবেদন')

পুষ্পে পুষ্পে তৃণে তৃণে
রূপে রূপে সেই ক্ষণে যে 'গূঢ়' রহস্য দিনে দিনে
হ'তো নিঃশ্বেসিত, আজি মর্ত্যের অপর তীরে বুঝি
চলিতে ফিরানু মুখ তাহারি চরম অর্থ খুঁজি'॥...
ব'লে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের 'মূঢ়' অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়॥
—(সেঁজুতি, 'জন্মদিন')

উপরোদ্ধৃত প্রথম ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'রূঢ়' ও 'মূঢ়' শব্দে যথাক্রমে 'রূ' ও 'মূ' সংস্কৃত রীতিতে দীর্ঘোচ্চারিত হ'য়ে দ্বিমাত্রক ধ্বনিমর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ দৃষ্টান্তে অক্ষরবৃত্ত পয়ারে এবং পঞ্চম দৃষ্টান্তে অক্ষরবৃত্ত দীর্ঘ-পয়ারে 'গূঢ়' ও 'মূঢ়' দ্ব্যক্ষর রূপেই পরিমিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গুরুভার 'ঢ়' অক্ষরটি 'ড়হ' রূপে উচ্চারণ করতেন ব'লে তা'র পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর 'রূ' ও 'মূ' মাত্রাবৃত্তে দ্বিমাত্রকতা লাভের প্ররোচনা পেয়ে থাকতে পারে; কিন্তু তদ্রূপ অজুহাতে 'গাঢ়' শব্দ ত্রিমাত্রক হলেও 'দৃঢ়' শব্দ কদাচ তা হ'তে পারে না, কারণ শেষোক্ত শব্দে 'ঢ়' বর্ণের পূর্ববর্তী "দৃ' হ্রস্বস্বর। এ-সম্পর্কে সদাস্মর্তব্য যে, কোনো ব্যতিক্রমের ব্যবহারই বেপরোয়া নয়,—তারও পিছনে একটা বিধান প্রচ্ছন্ন আছে। বাঙলা মাত্রাবৃত্তে ও অক্ষরবৃত্তে কেবলমাত্র দীর্ঘস্বর বা গুরুবর্ণ বিকল্পে সংস্কৃত রীতি-অনুযায়ী দ্বিব্যষ্টিক হ'তে পারে; কিন্তু কদাপি হ্রস্ববর্ণ বা

লঘুস্বর সে-সুবিধা (privilege) পেতে পারে না। ব্যাপারটা দৃষ্টান্ত-যোগে বিশ্লেষণ করছি।

দধি দুধ বিচি রাধা করিবে হেঁ কী।
কাজ 'না' বুঝ কেহ্নে গোআলার ঝী ॥
—(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ভারখণ্ড)

'পা' পাখালিয়া বীর পানী দিল মুখে।
ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুকে ॥
—(কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কালকেতুর ভোজন)

চলি চলি পা পা টলি টলি যায়।
গরবিনী হেসে হেসে আড়ে আড়ে চায় ॥
—(কড়ি ও কোমল, 'হাসি রাশি')

ডাক পাড়ে ও ঔ
ভাত আনো বড় বৌ।
—(সহজ পাঠ, প্রথম ভাগ)

জাগিয়া উঠি শয্যাতলে
শুধাল রাজ-বালা
'কে' পরালে মালা।
—(সোনার তরী, 'সুপ্তোত্থিতা')

ঐ মহা-মানব আসে।…
উদয়-শিখরে জাগে 'মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব-জীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি' উঠিল মহাকাশে ॥
—(শেষলেখা : ৬)

আমি বলি "চ ছ জ ঝ ঞ",
ও কেবল বলে "মিয়োঁ মিয়োঁ"।
—(শিশু, 'মাস্টার বাবু')

ক খ গ ঘ গান গেয়ে
জলে ডিঙি চলে বেয়ে।
—(সহজ পাঠ, প্রথম ভাগ)

উপরোদ্ধৃত প্রথম উদাহরণে 'মা', দ্বিতীয় উদাহরণে 'পা', তৃতীয় উদাহরণে 'পা পা', চতুর্থ উদাহরণে 'ও', পঞ্চম উদাহরণে 'কে', ষষ্ঠ উদাহরণে 'ঐ মহামানব' পদের 'মা' ও 'জয় জয় জয় রে' পদের 'রে' বাংলা ছন্দে ব্যতিক্রম হিসেবে সংস্কৃত রীতিতে দীর্ঘোচ্চারিত হ'য়ে দ্বিমাত্রকতার মর্যাদা লাভ করেছে। সপ্তম উদাহরণে 'চ ছ জ ঝ' পর্ব এবং অষ্টম উদাহরণে 'ক খ গ ঘ' পর্ব চতুরক্ষর, তাতে প্রতিটি অক্ষর হ্রস্বোচ্চারিত ব'লে এক-মাত্রক; এখানে কোনো দীর্ঘবর্ণ বা গুরুস্বর নেই ব'লে দ্বিমাত্রকতার প্রশ্ন ওঠেনা। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র তাঁর 'বাংলা ছন্দে রীতি-লঙ্ঘন' প্রবন্ধে 'লু বয়ে যাওয়া', 'ল পড়া যত', 'শ পড়ে নাই' এবং 'থ বনে যায়' পর্বসমূহে যথাক্রমে 'লু', 'ল', 'শ' এবং 'থ' প্রভৃতি হ্রস্বোচ্চারিত মুক্তধ্বনি বা 'মুক্তদল দ্বিমাত্রক' বলেছেন।[১৬] তাঁর এই অভিমত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য; তাতে অবশ্যই "পরিশীলিত কানের সায়" নেই। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশি' প্রথম ভাগ থেকে উদ্ধৃত উদাহরণটিতে 'অ', 'ঘ' ও 'ঝ' দ্বিমাত্রক রূপে প্রযুক্ত হয়েছে; তা অনুমোদন-ব্যপদেশে প্রবোধচন্দ্র বলেছেন: "অ ক খ প্রভৃতি মুক্তদলগুলি স্বভাবতঃই বাঙালীর মুখে স্বতন্ত্র ও দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চারিত হয়।"[১৭] তাঁর এই অভিমতও অভ্রান্ত নয়। তাঁর এই ধারণাকে নিতান্তই মনগড়া ও স্বকপোলকল্পিত বলতে আমার দ্বিধা নেই।

উপরোদ্ধৃত চতুর্থ উদাহরণে 'ও' বাংলা ছন্দে ব্যতিক্রম হিসেবে সংস্কৃত-ভঙ্গীতে দ্বি-মাত্রক হয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' কাব্যে 'ও' একমাত্রক-তার সংকুচিত আসন পেয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত তুলছি:

v v v v v v — v —v —— v v v v — v v —v v
গহন রয়নমে ন যাও বালা নওল কিশোরক পানশ।
v v — v v v v vv v v — v v v — — v v v —v v |
গরজে ঘন ঘন বহু ডর পাওব কহে ভানু তব দাস ॥
—(ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী: ১৩)

এটি ৮+৮+৮+৪ মাত্রার সংস্কৃত গাথা-ছন্দে সংরচিত। অথচ এখানে 'যাও', 'নওল' এবং 'পাওব' শব্দে 'ও' হ্রস্বস্বর-রূপে নিরূপিত হয়েছে। ব্রজবুলি ও মৈথিলী ছন্দে এতাদৃশ ব্যতিক্রম বিস্তর পরিদৃষ্ট হয়। একটি নমুনা:

ভূপালী ॥
মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিলা বাট ॥ [১৮]
—(গোবিন্দদাস)

এস্থলে নিখুঁত পাদাকুলক পদ্ধতিতে লেখা হতে পারতো:

— v v — v v v v v v—v v
মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
v v — — v v —v v—v v
চলিতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥

এই প্রথাসিদ্ধ পথ পরিহার ক'রে সংস্কৃত মাত্রাছন্দের সঙ্গে পার্থক্য রক্ষার পরোক্ষ উদ্দেশ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিগণ এবম্প্রকার বৈলক্ষণ্য অবলম্বন করেন। কিন্তু 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' কাব্যে 'ও' কেন একমাত্রকতার মূল্য পেল, তার হেতু বিশেষজ্ঞেরা বলতে পারেন।

বাংলা কবিতায় সংস্কৃতের ধরন-ধারণ বিরলভাবে হলেও কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়।

ঘুমায় রাজা, ঘুমায় রাণী-মাতা,
কুমার সাথে ঘুমায় রাজভ্রাতা;
(সোনার তরী, 'নিদ্রিতা')

এটি পঞ্চমাত্রক বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর 'রাজভ্রাতা' শব্দের 'জ' বর্ণ সংস্কৃত নিয়মে দ্বিমাত্রক; কারণ সংস্কৃত ধরনের আবৃত্তি-ভঙ্গীতে 'রাজভ্রাতা' শব্দের উচ্চারণ হয় 'রাজভ্-রাতা'-রূপে, ফলে যুক্তধ্বনি 'জভ্'-এর পূর্বলগ্ন 'জ' বর্ণ দ্বিমাত্রকতার মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু বাংলা ভঙ্গীতে 'ঘুমায় রাজভ্রাতা' আবৃত্তি করা হয় 'ঘুমায় রাজ-ভ্রাতা'-রূপে; ফলে 'ঘুমায় রাজ' পর্বের প্রান্তিক 'জ'-বর্ণ একমাত্রক। এই রীতির বৈকল্পিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত :

আমারে যেন না 'করি প্রচার' আমার আপন কাজে;
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।
—(গীতাঞ্জলি : ১)

এটি ষন্মাত্রক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সংরচিত। কিন্তু এর 'করি প্রচার' পর্বটি বাংলা ভঙ্গীর আবৃত্তিতে পাঁচ মাত্রা হ'লেও, এখানে সংস্কৃত প্রণালীতে 'করিপ্-রচার' রূপে উচ্চারিত হ'য়ে সাত-মাত্রার স্থলে বিকল্পে ছয়-মাত্রার খণ্ডিত মূল্য পেয়েছে। এর পর্বমধ্যে উপযতি পড়েছে, পর্বযতি ও পদযতি পড়েছে 'করি প্রচার' পর্বের অন্তে। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধ :

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানুং
বপ্রক্রীড়া পরিণতগজ প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥ [১৭]

এখানে 'আষাঢ়স্য' এবং 'পরিণতগজ' পদ দু'টির পরে যতিপাত হ'লে এই দু'টি পদ হয় যথাক্রমে সপ্তমাত্রক ও ষন্মাত্রক—মন্দাক্রান্তার নিয়মে অষ্টমাত্রক ও সপ্তমাত্রক নয়। অতএব এই দু'টি পদ যতিসীমা ডিঙিয়ে পরবর্তী পদের মধ্যে যতিস্থাপন ক'রে যথাক্রমে আবৃত্তি করা হয় 'আষাঢ়স্যপ্-রথম দিবসে' এবং 'পরিণতগজপ্-রেক্ষণীয়ং'-রূপে এবং সে-ভাবে সন্ধি-সমাসের দৌলতে ছন্দরক্ষা হয়। এভাবে পদযতির ব্যবধান লঙ্ঘন ক'রে পরবর্তী পদের মধ্যে যতিস্থাপন সম্বন্ধে 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্রম্'-এর ভাষ্যকার ভট্ট হলায়ুধ

মন্তব্য করেছেন যে, পদমধ্যে যতিস্থাপন দূষনীয় : "পদমধ্যে যতির্দুষ্যতি।"[২০] কিন্তু ছন্দ-বৈয়াকরণের কাছে আপত্তিকর হলেও, মহাকবি কালিদাসের অলৌকিক প্রতিভা-গুণে তাঁর 'মেঘদূত' কাব্যে এরূপ অস্থানে যতিখণ্ডন পাঠকের কাব্যবোধে সঞ্চার করেছে ব্রহ্মস্বাদসহোদর রস। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতাটিতে 'করি প্রচার' পর্বে যতিপাতন 'পদমধ্যে' হয়নি, লঘুযতি (primary pause) পড়েছে পরবর্তী উপপর্ব-মধ্যে; সুতরাং তা আদৌ দোষাবহ হয়নি, এবং তার প্রসঙ্গে 'যতির্দুষ্টেতি ভাবঃ' কথা ওঠেনা।

প্রবোধচন্দ্র "ঋ-কার যুক্ত বর্ণের দ্বৈতরূপ" বিষয়েও দৃষ্টান্ত-সমৃদ্ধ উপাদেয় আলোচনা করেছেন। নিম্নে 'অমৃত' শব্দের মাত্রামূল্য নির্ধারণের কৌতুকোদ্দীপক দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

করতলে সেবা, বুকে 'অমৃত', নয়নে দিলাম আলো,
যদি পার, বেশি, নতুবা আমারি মতন বাসিয়ো ভালো।
—(কল্লোল, ১৩৩৫ ফাল্গুন, ৭৭১ পৃষ্ঠা)

করতলে সেবা, বুকে 'অমৃত', নয়নে দিলাম আলো,
যদি পারো, বেশি —নতুবা আমারি মতন বাসিয়ো ভালো।
—(অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অমাবস্যা : ১২)

উপরোদ্ধৃত প্রথম উদাহরণে 'অমৃত' (অম্-ঋত) চতুর্মাত্রক; কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণে 'অমৃত' (অ-মৃত) ত্রৈমাত্রক।

অক্ষরবৃত্তে 'মাভৈ' শব্দ রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ ত্র্যক্ষর-রূপে গণ্য করেছেন; তার একটি মাত্র ব্যতিক্রম :

হে দুয়ার, জীবলোক তোরণে তোরণে
করে যাত্রা মরণে মরণে।
মুক্তি-সাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে
মাভৈ বাজে নৈরাশ্য-নিশীথে॥
—(পরিশেষ, 'দুয়ার')

এখানে 'মাভৈ' দ্ব্যক্ষর ব'লে গৃহীত হয়েছে। এ-সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্রের এক পত্রের উত্তরে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ তারিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন যে, 'মাভৈ বাজে' সাধু (অক্ষর-বৃত্ত) রীতির ছন্দেও 'ত্রুটিহীন'।[২১] ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর লিখেছিলেন :

এই রূপে বর্ধমানে রহিলা আকাশ-থানে
সুন্দরেরে করিয়া অভয়।
মা ভৈষী মা ভৈষী বেটা তোরে বা বধিবে কেটা
তবে আজি করিব প্রলয়॥
—(বিদ্যাসুন্দর, 'দেবীর আশ্বাস-বাক্য')

এখানে 'মা ভৈষী' ত্র্যক্ষর-রূপে গণনীয়; সুতরাং রবীন্দ্রনাথ 'মাভৈ' শব্দ দ্ব্যক্ষর ব'লে স্বভাবতঃই ভাবতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে, 'তুইও' শব্দে 'ইও' বাংলা ছন্দে "মাত্রা-গণনায় বিকল্পে এক বা দুই মাত্রার পরিমাণ পেয়ে থাকে।"[২২] মধুসূদনের 'তুইও কি দুঃখিনী' (ব্রজাঙ্গনা কাব্য, 'ময়ূরী') এবং হেমচন্দ্রের 'কইও তারে মম' (বৃত্রসংহার কাব্য, অষ্টাদশ পর্ব) ধ্বনি-পরিমাপের বিচারে সমতুল; সুতরাং 'তুইও' শব্দের মতো 'কইও' শব্দ দ্বিব্যষ্টিক হয়েছে। 'একই' শব্দ রবীন্দ্র-কথিত নিয়ম-অনুসারে বিকল্পে দ্বিব্যষ্টিক বা ত্রিব্যষ্টিক হতে পারে। যেমন:

সেখানে দেখিতে পাবি ধন আর ক্ষতি,
তরঙ্গের ওঠা-নামা, একই খেলা, একই তার গতি।
—(পরিশেষ, 'যাত্রী')

একই নরক আর একই স্বরগ
এক অমরতা কিংবা একই নির্বাণ।
—(সন্ধ্যাসঙ্গীত, 'সম্মিলন')

উপরের প্রথম উদাহরণে 'একই' দ্বিব্যষ্টিক, কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণে 'একই' ত্রিব্যষ্টিক।

অক্ষরবৃত্তে 'পাইল' শব্দও এরূপ বৈকল্পিক ধ্বনিমূল্য পেয়ে থাকে। যথা:

রক্ষা 'পাইল' কোন মতে পাতালে পশিয়া;
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দৈত্যের আবাস।
—(বৃত্রসংহার কাব্য, দশম সর্গ)

কহিলেন নব ধর্ম; 'পাইল' নির্বাণামৃত
সংখ্যাতীত নরনারী, পিতা শুদ্ধোধন।
—(নবীনচন্দ্র সেন, অমিতাভ, সপ্তদশ সর্গ)

উপরের প্রথম উদাহরণে 'পাইল' দ্ব্যক্ষর এবং দ্বিতীয় উদাহরণে 'পাইল' ত্র্যক্ষর-রূপে গণনীয়।

শ্রী দিলীপকুমার রায় ছন্দসন্ধি ও ছন্দসমাস বিষয়ে সারবান আলোচনা করেছেন।[২৩] ছন্দসন্ধি (metrical liaison) বিষয়ে প্রবোধচন্দ্রের তথ্যবহুল ও জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনা মনে ওৎপ্রোত প্রতিক্রিয়া ও এষণা-প্রবণ ঔৎসুক্যের উদ্রেক করে।[২৪] নিম্নে ছন্দসন্ধির একটি নজির তুলিছ:

'নপুংসক ঐ' শিখণ্ডী আজ রথের সারথি তব,
হানো বীর তব বিদ্রূপ-বাণ সব বুক পেতে ল'ব।...
অর্গল এঁটে' সেথা হ'তে তুমি 'দাও অনর্গল' গালি;
গোপীনাথ ম'ল? সত্য কি? মাঝে মাঝে দেখো তুলি' জালি।...

জ্ঞান-অঞ্জন-শলাকা তৈরী হয়েছে এদের তরে ;
দেখিবে এদের 'আর্টের আঁটুনি' একদিনে গেছে ছ'ড়ে।...
'তোমার আর্টের' বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হ'বে না এরা,
প্রয়োজন-বাঁশে 'তোমার আর্টের' আটচালা হবে নেড়া।
—(নজরুল ইসলাম, ফণি-মনসা, 'সাবধানী ঘণ্টা')

এখানে 'নপুংসক ঐ', 'আর্টের আঁটুনি' এবং 'তোমার আর্টের' পর্বগুলি যথাক্রমে 'নপুংসকৈ', 'আর্টেরাঁটুনি' ও 'তোমারার্টের' রূপে পঠিত হ'য়ে ছন্দরক্ষা করেছে। উপরোদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকে 'দাও অনর্গল' পর্বের 'ও+অ' স্বরবর্ণ-যুগল একটি স্বরবর্ণ-রূপে উচ্চারিত (synoezesis) হ'য়ে পর্বটিকে ষণ্মাত্রিকতার মর্যাদা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ' কাব্যের 'বৈশাখ-আবাহন' কবিতায় 'দাও উড়ায়ে' পর্বের 'ও+উ' স্বরবর্ণদ্বয় এভাবে ধ্বনিসংযোগ ক'রেই একটি একমাত্রক (monomoric) স্বরবর্ণ-রূপে পরিগণিত হ'য়ে ছন্দরক্ষা করেছে। এখানে 'দাও অনর্গল' পর্বের 'ও+অ' এবং শেষোক্ত 'দাও উড়ায়ে' পর্বের 'ও+উ' সাচ্ছন্দ্য-সহকারে ধ্বনিসংযোগ করতে পেরেছে 'অ' এবং 'উ' হ্রস্বস্বর ব'লে ; তা দীর্ঘস্বর হ'লে সে-রকম স্বাচ্ছন্দ্যবহ ধ্বনিসংহতি দৈবাৎ সম্ভবপর হ'তো ব'লেই আমার সুদৃঢ় অভিমত।[২৫] উক্ত 'বৈশাখ-আবাহন' কবিতায় 'দাও আসি' পর্বের 'ও+আ' ধ্বনিসংযুক্ত না হ'য়ে 'দাও আসি' পর্বের 'ধ্বনিমূল্য সাধারণ রীতি-অনুসারে' হয়েছে চার ব্যষ্টি। প্রবোধচন্দ্র উক্ত 'দাও উড়ায়ে' পর্বের 'ও+উ'কে "শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনির সংকোচন" এবং তা "এ-ছন্দের প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম" বলেছেন।[২৬] জিজ্ঞাসা করি, এখানে 'দাও উড়ায়ে' পর্বে 'দাও' শব্দের 'ও' কি 'শব্দপ্রান্তিক যুগ্মধ্বনি'? এবং স্বাভাবিকভাবে এই 'ও' কি এরূপ অভিধা লাভের অধিকারী হ'তে পারে ?

সেকালে অনেক কবি ছন্দপঙ্ক্তির গঠন ও যতিস্থাপন নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। নিম্নে তার তিনটি নজির তুলছি :

৭　　৪　　৬
তবে দেখি তাহারে　সেই ত দ্বারে　　প্লবঙ্গমগণ।
তারা তরু-শিখরী　　করেতে ধরি'　রহে সুখীমন॥[২৭]
—(কৃত্তিবাসী রামায়ণ)

৬　　৪　　৬
তবে রঘুবর　　জুড়ি' শর　　নিজ ধনুর্গুণে
কাটিলেন তার　ধনু আর　　শর আর তুণে॥
—(রঘুনন্দন গোস্বামী ,রাম-রসায়ন, 'রাম-রাবণের যুদ্ধ)

৬　　৩　　৪
শৃগাল হইয়া　　সিংহের　　সঙ্গে যুঝে।
কুটিকের মধ্যে　গুটিকে　　তাহা বুঝে॥[২৮]
—(শুকুর মাহ্‌মুদ, গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস)

আধুনিক কালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে এ-প্রকার পরীক্ষা করেন। কিন্তু সে-সকল ছন্দ-প্রণালী প্রচলিত হয়নি। প্রবোধচন্দ্র চলিত ও অচলিত প্রায় সকল প্রকার ছন্দবিধির বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা ক'রে বাংলা ছন্দশাস্ত্রের একটা স্বনির্ভর কাঠামো দাঁড় করানোর জন্যে অক্লান্ত সাধনা করেছেন। প্রধানতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় আজ বাংলায় ধ্বনি-ভিত্তিক ছন্দঃপ্রকরণ প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছে। তিনি প্রচলিত প্রথাসিদ্ধ ছন্দরীতিগুলির আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত গঠন-বৈশিষ্ট্যের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রসঙ্গ-ক্রমে অধুনা-অপ্রচলিত অক্ষরবৃত্ত রীতির নর্তক ত্রিপদী, মালতী, মালঝাঁপ প্রভৃতি ছন্দো-বন্ধের রূপগত ও গুণগত পরিচয় প্রদানের প্রয়োজনীয়তা মিটিয়েছেন। মালঝাঁপ পয়ারের নমুনা :

নেড়ে ঘাড় ভেঙে চাড় দিয়ে ষাঁড় নাচে।
কী উল্লাস ছেড়ে শ্বাস নাহি ঘাস যাচে ॥
—(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সারদা-মঙ্গল)

এখানে প্রতি পঙ্ক্তিতে চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ অক্ষরে মিল (rhyme) রয়েছে। প্রবোধ-চন্দ্র মধ্যমিল, অন্ত্যমিল, অনুপ্রাস, যমক, ছন্দঃসন্ধি, ধ্বনিসংযোগ, ধ্বনিসংঘাত, ধ্বনি-লিপি, ধ্বনিশ্রুতি, যতিভেদ, যতিবিলোপ, পর্ববন্ধ, পদবন্ধ, শ্লোকবন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর দৃষ্টান্ত-যোগে যে-যুক্তিনির্ভর পর্যালোচনা করেছেন, তাতে বাঙলায় একটা স্বতন্ত্র ছন্দ-সাহিত্য সৃষ্টি হতে চলেছে। মধ্যমিলের দৃষ্টান্ত :

কাছা-খোল্লা যত মোল্লা তোবা তাল্লা ডাকে।
—(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'আগরার যুদ্ধ')

জ্বল্‌ছে নূতন দীপ্তি-রতন তিমির-মথন শুভ্ররাগে
—(রবীন্দ্রনাথ, পূরবী, 'বিজয়ী')

মাঠের বাঁশী বন-উদাসী ভীম-পলাশী গায়।
—(নজরুল ইসলাম, ছায়ানট, 'হাওয়া')

উপরোদ্ধৃত প্রথম উদাহরণ অক্ষরবৃত্ত, দ্বিতীয়টি মাত্রাবৃত্ত এবং তৃতীয়টি স্বরবৃত্ত। নিম্নে অন্ত্যমিলের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত-সভায়
বহু সাধুবাদ-ধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে।
—(কল্পনা, 'জগদীশচন্দ্র বসু')

জোছনা আকুল, ঝরিছে বকুল, তটিনী দোদুল-গামিনী ;
দূরে ডাকে পিক, ফুলে ঢাকে দিক, আঁখি অনিমিক কামিনী।
---(অক্ষয়কুমার বড়াল, প্রদীপ, 'মধু-যামিনী')

যাস্ কোথা সই একলা ও তুই অলস বৈশাখে ?
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে ?
—(নজরুল ইসলাম, ছায়ানট, 'দুপুর-অভিসার')

উপরোদ্ধৃত প্রথম উদাহরণে 'মণ্ডিত' শব্দের সঙ্গে 'পণ্ডিত' শব্দের মিল-বিধান পঙ্‌ক্তি-প্রান্তে ঘটেনি ; কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যত্যয় শ্রুতিতে যে-ধ্বনিরস বর্ষণ করেছে তার মাধুর্য অপূর্ব। 'কণ্ঠরবে' ও 'গৌরবে' শব্দে অন্ত্যমিল প্রথাবদ্ধভাবে ঘটেছে। দ্বিতীয় উদাহরণ ৬+৬+৬+৩ মাত্রার তরল ত্রিপদী। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এই কবিতাটিতে একটিও যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়নি। তৃতীয় উদাহরণ ৪+৪+৪+১ স্বরের স্বরবৃত্ত। এখানে পঙ্‌ক্তি-প্রান্তের চারটি স্বরে যেভাবে মিল-সংস্থান হয়েছে তা কবি-প্রতিভার অসাধারণ দক্ষতার পরিচায়ক।

প্রবোধচন্দ্রের লেখা 'মেঘদূত' (মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৩৭), 'মেঘদূত ও কুমারসম্ভব' (বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৮), 'কালিদাস ও মেঘদূত' (বৈশাখ ১৩৪৪) এবং 'অনুবাদে মেঘদূত' (আষাঢ় ১৩৭৫) প্রভৃতি প্রবন্ধে দেখা যায় যে, প্রকরণবিদ্যা পা বাড়িয়েছে রস-সাহিত্যের সীমানার দিকে,—ছন্দতত্ত্বের উত্তরণ হয়েছে নন্দনতত্ত্বের পথে। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার ছন্দ' (পূর্বাশা, রবীন্দ্রস্মৃতি-সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৮) একটি অসাধারণ সারবান প্রবন্ধ। তিনি তাতে বলেছেন :

"স্বভাবতঃই গদ্যের কোনো ছন্দ থাকতে পারে না, বস্তুতঃ 'গদ্যের ছন্দ' কথা-টাই স্ববিরোধী।...

"গদ্যকবিতায় সুস্পষ্ট ছন্দ নেই বটে, কিন্তু ছন্দের আভাস আছে। এ-রকম 'ছন্দাভাস'-যুক্ত গদ্যকবিতাকে 'ছন্দোগন্ধি' বা 'পদ্যগন্ধি' কবিতা ব'লে অভিহিত করাই সমীচীন। কেননা, ও-সব কবিতার ভাষা 'অসংকুচিত' অর্থাৎ নিছক আটপৌরে গদ্য-রীতিসম্মত নয়। ও-সব কবিতার ধ্বনিতে কিঞ্চিৎ ছন্দের আভাস দেবার জন্যে আটপৌরে সাধারণ গদ্যভাষাকে যে কিছু পরিমাণে বিপর্যস্ত করতে হয়, এ-কথা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। বস্তুতঃ, সাধারণ গদ্যের অন্বিত অংশগুলিকে একটু অসাধারণভাবে বিন্যস্ত করার উদ্দেশ্যই হলো গদ্যের ভঙ্গীর মধ্যে কতকটা ছন্দের আভাস সঞ্চার করা।...

ছন্দোবদ্ধ কবিতায় ধ্বনিময় বাক্ এবং ভাবময় অর্থ, এ দু'য়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব কতখানি তা ভেবে দেখা দরকার। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ছন্দোবদ্ধ রচনায় বাক্ ও অর্থ, ধ্বনি ও ভাবের সমান প্রাধান্য থাকে না ; অর্থাৎ এ উভয়ের মধ্যে

পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায় না।···ধ্বনিগত সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়োজনে কবিকে ছন্দের বহু বিধিবিধান মেনে চলতে হয়; তার ফলে বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির পারম্পরিক অন্বয়কে বহু স্থলেই লঙ্ঘন করতে হয়—মেঘদূতের প্রথম শ্লোকে 'কশ্চিৎ যক্ষঃ বসতিং চক্রে' এই কথাটা ছন্দের প্রয়োজনে কি রকম ভাবে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়েছে, তা মনে করলেই পূর্বোক্ত মন্তব্যের সার্থকতা বোঝা যাবে; বাংলা কবিতায় এতটা দূরান্বয় স্বীকৃত না হ'লেও ছন্দের প্রয়োজনে অন্বয়কে অনেকখানি উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়।''

মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের প্রথম শ্লোকের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তির প্রারম্ভিক দু'টি পদ: ''কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা/যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া /স্নিগ্ধ-চ্ছায়া তরুষুবসতিং''; মন্দাক্রান্তার এই নিখুঁত ছন্দবিন্যাস কিরূপে ভাবের বহুধা বিশ্লেষ ঘটিয়ে ''কশ্চিৎ যক্ষঃ বসতিং চক্রে'' কথাটারই দূরান্বিত রূপ হ'লো, তা তিনি বিশ্লেষণ ক'রে বলেননি ব'লে তাঁর এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমার ন্যায় সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে অনুধাবন করা বাস্তবিকই দুষ্কর হয়েছে।

প্রবোধচন্দ্র তাঁর 'অনুবাদে মেঘদূত' প্রবন্ধে বলেছেন যে, ৪+৬+৭ অক্ষর তথা ৮+৭+১২ মাত্রার মন্দাক্রান্তার বাঙলা আদলে তার শেষ সাত-অক্ষর তথা বারো-মাত্রার পাদ সকলেই সাত-পাঁচ মাত্রায় বিভক্ত করেছেন। নিম্নে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ থেকে দু'টি দৃষ্টান্ত তুলছি:

৮ ৭ ৭ ৫
হেথায় রম্য অটবী, কোথায় হায় কবি, জাগিছে তারি ছবি কল্পনা-প্রাণে।
নয়নে উদ্যান শোভে, কোকিল শ্রুতি-লোভে, হৃদয় কেন ক্ষোভে হৃদয় জানে।।
—(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বপ্নপ্রয়াণ, নন্দন পুর-প্রয়াণ)

৮ ৭ ৭ ৫
কেন গো আপন মনে ভ্রমিছ বনে বনে, সলিল দু'নয়নে কিসের দুখে?
কমলা দিতেছে আসি' রতন রাশি রাশি, ফুটুক তব হাসি মলিন মুখে।
—(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাল্মীকি-প্রতিভা, তৃতীয় দৃশ্য)

উপরোদ্ধৃত প্রথম উদাহরণ সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার বাংলা আক্ষরিক (literal) প্রতিরূপ এবং দ্বিতীয় উদাহরণ তার মাত্রিক (moric) প্রতিরূপ। কিন্তু এগুলিকে প্রবোধচন্দ্র বলেন: ''দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের 'কলাবৃত্ত' মন্দাক্রান্তার'' নমুনা। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে অক্ষরবৃত্ত রীতিতে মন্দাক্রান্তার খণ্ডিত যতিবিভাগ (অর্থাৎ ৮+৭+৭+৫) অনুসারে সংরচিত তিনটি অধ্যায়াংশের চারটি স্তবক যুক্তাক্ষর-বিরহিত; সুতরাং সে-গুলির ধ্বনিসাম্য মাত্রাবৃত্ত (তথা কলাবৃত্ত) রীতিতেও সিদ্ধ হ'লেও তাদের ঠাট অক্ষর-বৃত্তের ব'লে সে-গুলি মাত্রাবৃত্তের পর্যায়ে পড়েনা। আরও লক্ষণীয় যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ এ-ছন্দে 'মাধবী শরন্মই' পদ আট-অক্ষর এবং 'সৌরভ সংযুক্ত' পর্ব সাত-অক্ষর রূপে

প্রয়োগ করেছেন ; এরূপ প্রয়োগ ছন্দের উৎক্রম (deviation) ছাড়া আর কী হ'তে পারে ? প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য যে, প্রবোধচন্দ্র কি সনাতন অক্ষরবৃত্তকে তাঁর উদ্ভাবিত নব্য পরিভাষায় 'মিশ্রকলামাত্রিক' (mixed moric style) না বলে একেবারে সোজা 'কলাবৃত্ত' (moric) বলতে চান ?

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুকরণে' রচিত 'যক্ষের নিবেদন' কবিতার দ্বিতীয় পাদে সর্বথা পাঁচটি মুক্তস্বনির পর একটি রুদ্ধধ্বনি ব্যবহার ক'রে ছয়-স্বর সাত-মাত্রা নিয়মিত করেছেন। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার দ্বিতীয় পাদে 'দিবস—গণনার,' 'নগরবাসীদের', 'নয়ন-যুগলের', 'রাবণ-সাথে হয়,' 'কুবের-ভবনের' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন, যেখানে 'দিবস', 'নগর' 'নয়ন', 'রাবণ', 'কুবের' প্রভৃতি শব্দে যথা-ক্রমে 'স,' 'র', 'ন', 'ণ' এবং 'র' বর্ণ হস্-বর্জিত মুক্তধ্বনি না হ'লে মন্দাক্রান্তা-বিধির বিচ্যুতি ঘটে। তবুও এটাকে যোগীন্দ্রনাথের নূতন ঠমক বা ঢঙ্ বলা চলে না কি ? প্রবোধচন্দ্র ১৩৫২ আশ্বিনের শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় 'বাংলা ছন্দ ও ছন্দশাস্ত্র', ১৩৮০ সালের বার্ষিক সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় 'বাংলা ছন্দ-সাহিত্য' এবং ১৩৮৩ চৈত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের গবেষণা-পরিষদ কর্তৃক সংকলিত 'বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা' পুস্তকের ১-৮৫ পৃষ্ঠাব্যাপী 'ছান্দসিকের চিন্তায় বাংলা ছন্দ' শিরোনামে যে-সকল তথ্যসমৃদ্ধ মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন, সেগুলির সম্পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখা যেতে পারে তাঁর 'আধুনিক বাংলা ছন্দ-সাহিত্য' গ্রন্থে (৩০শে শ্রাবণ, ১৩৮৭)। সে-গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছন্দ-সরস্বতী' (বৈশাখ ১৩২৫) থেকে শুরু ক'রে দেবতোষ বসুর 'বাংলা ছন্দের প্রগতি' (১ বৈশাখ ১৩৮৫) পর্যন্ত গত ষাট বৎসরে প্রকাশিত প্রায় সকল ছন্দগ্রন্থ ও ছন্দালোচনার যথাজ্ঞান সবিস্তার বিবরণ ও বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত হয়েছে ; তার ফলে গ্রন্থটি হয়েছে এই জটিল প্রকরণ-বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির অমূল্য আকর ও প্রেরণা-প্রদায়ী দিক্‌দর্শন-স্বরূপ। পরম বিপশ্চিৎ মহামনস্বী ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (অগস্ট ১৯৩৯), 'সংক্ষিপ্ত ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (অগস্ট ১৯৪৫) ও 'সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (জানুআরি ১৯৫৭) গ্রন্থত্রয়ে তাঁর বাংলা ছন্দ-বিষয়ক পরিপ্রেক্ষণ ও পরিশীলন পুনঃ পুনঃ কেন মোড় পরিবর্তন করেছে, তার নিগূঢ় তত্ত্ব প্রবোধচন্দ্র প্রচুর তথ্য সমাবেশযোগে বৈচক্ষণ্য-সহকারে অথচ নিরাসক্ত চিত্তে উন্মোচন করেছেন। সর্ব-প্রশস্য প্রাজ্ঞ সুনীতি-কুমার বারো-অক্ষরের ঘরানা সংস্কৃত 'তোটক' ছন্দের যে-নমুনা পরিবেশন করেছেন, তাতে আছে এই পঙ্‌ক্তিটি :

VV —V — — VV—V V—
নব চন্দ্র শোভা গগনের পটে। [২৯]

বৃত্তচ্ছন্দ তোটকের পাদে পরপর চারটি 'স'-গণ (VV—), অর্থাৎ দু'টি লঘু একটি গুরু এইরূপে বারো-অক্ষর তথা ষোল-মাত্রা বিন্যস্ত হ'য়ে থাকে। কিন্তু উপরোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিতে আছে 'স'গণ + 'য'গণ (V — —)+স'গণ + 'স'গণ ; ফলে তা তোটক ছন্দ হয়নি ;

কারণ তাতে লঘু-গুরু অক্ষরের সুনির্দিষ্ট পর্যায়ক্রম রক্ষিত হয়নি এবং মাত্রা-সংখ্যা হয়ে গেছে ষোলো স্থলে সতের।

পরম শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার 'পর্যায়-সম' মিল ও 'মধ্য-সম' মিলের দু'টি নিখুঁত নমুনা দিয়েছেন।[৩০] পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থে পয়ারের 'পর্যায়-সম' ও 'মধ্য-সম' রূপ উদাহৃত হয়েছে।[৩১] সুনীতিকুমার 'পর্যায়-সম' ও 'মধ্য-সম' পরিভাষাদ্বয় উক্ত গ্রন্থ থেকেই গ্রহণ করেছেন।

সুনীতিকুমার 'ত্রিপদী বা লাছাড়ী' এবং 'চৌপদী' ছন্দোবন্ধের প্রয়োজনীয় নমুনা দেননি। তিনি বলেছেন: "প্রচলিত ত্রিপদী দুই প্রকারের: লঘু-ত্রিপদী ও দীর্ঘ-ত্রিপদী"; এবং "লঘু ও দীর্ঘ দুই প্রকারের চৌপদী হয়", তার "প্রতি চরণে চারিটি করিয়া যতি থাকে এই জন্য এই নাম (চতুষ্পদী বা চৌপদী)।" তিনি লঘু-ত্রিপদী, দীর্ঘ-ত্রিপদী লঘু-চৌপদী ও দীর্ঘ-চৌপদী ছন্দোবন্ধের কতিপয় নজির উপস্থাপিত করেছেন।[৩২] দ্বিপদী- ও ত্রিপদীর প্রতি পদ সাধারণতঃ আট ব্যষ্টি-যোগে গঠিত হয়। অক্ষরবৃত্ত রীতির 'ত্রিপদী-বন্ধের উদাহরণ:

রণ করে যুবরাজ সেনাপতি পায় লাজ
রাজা শরাসন পুরে।
ভীমরথ ভীম মল্ল আর বীরসেন শল্য
চর্মের উপরে ঘুরে।।
—(কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কালকেতুর যুদ্ধ)

অক্ষরবৃত্ত রীতির পূর্ণ 'চৌপদী'-বন্ধের উদাহরণ:

অলঙ্কার বলে কা'রে ও-বালিকা জানে না রে,
প্রকৃতির অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা অযতনে।
বালাই লইয়া মরি, বিধাতার কারিগরী,
আজি একাধারে হেরি' বিস্ময় মানিনু মনে।।
—(রাজকৃষ্ণ রায়, 'বালিকা-প্রতিভা'; আর্যদর্শন, বৈশাখ ১২৮৮)

অক্ষরবৃত্ত রীতির যথার্থ দীর্ঘ-চৌপদী:

সেজন না হঅ এহি স্বপ্নেত দেখিলুঁ জেহি
মোর তরে গেল কহি,' সেহি মোর পরমার্থ বাণী।
কহিতে মরম-ব্যথা কহিল সে মোক কথা,
আকুল হইলুঁ তথা শুনিতে হইল বুদ্ধি হানি।।
—(শাহ্ মোহাম্মদ সগীর, ইছুপ-জলিখা কাব্য।)

মাত্রাবৃত্ত রীতির দ্বিপদী :

সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকট দর্শন,
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ।
—(রবীন্দ্রনাথ, নবজাতক, 'বুদ্ধভক্তি')

মাত্রাবৃত্ত রীতির পূর্ণ ত্রিপদী :

পরণে বসন লাল, খোলা কুন্তল-জাল
কাছে এল এক বালা;
গ্রীবাটি বাঁকায়ে ধরি' দাঁড়াইল সুন্দরী
আননে করুণা ঢালা।
—(করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝরা ফুল, 'পাগলিনী')

মাত্রাবৃত্ত রীতির দীর্ঘ-ত্রিপদী :

বাদ্‌শার মুখখানা গুরুতর গম্ভীর
মহিষীর হাসি নাহি ঘুচে;
কহিলা বাদশা-বীর 'যত গুলো দম্ভীর
দম্ভ মুছিব চেঁচে-পুঁছে।'
—(রবীন্দ্রনাথ, খাপছাড়া : ৫)

স্বরবৃত্ত রীতির দীর্ঘ-ত্রিপদী :

তুমি ভাবো এই যে বোঁটা কিছুই বুঝি নয় কো ওটা,
ফুলের গুমোর সবার চেয়ে বড়ো,—
বিমুখ হ'য়ে আজ যদি ও আল্‌গা করে বাঁধন স্বীয়,
তখনি ফুল হয় যে পড়ো-পড়ো।
—(রবীন্দ্রনাথ, গল্প-সল্প, 'ম্যানেজার বাবু')

স্বরবৃত্ত রীতির চৌপদী :

একটি যুবা সুগৌর হ্রস্ব চ'ড়ে একখান চতুরশ্ব
মন্দগতি 'ফেটিনাখ্য' যানে যাচ্ছেন সগৌরবে;—
অতি সুপ্রসন্ন মূর্তি পরণে তা'র রেশমী কূর্তি,
রেশমী ধূতি, জরির টুপি, বয়স বছর পঁচিশ হ'বে।
—(দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, সপ্তম চিত্র : 'বিবাহ-যাত্রী')

পূর্বেই বলেছি, দ্বিপদী (৮+৮ ব্যষ্টির পূর্ণ পয়ার), ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর প্রতি পূর্ণ পদে সাধারণতঃ আট ব্যষ্টি (metrical unit) থাকে। ত্রিপদীতে থাকে ৮+৮+৮ ব্যষ্টি; তার প্রথম ও দ্বিতীয় পদের প্রত্যেকটিতে দুই ব্যষ্টি ন্যূন হ'লে তার অভিধা হয় 'লঘু-ত্রিপদী',

এবং তৃতীয় পদে দুই ব্যষ্টি বৃদ্ধি হ'লে তার অভিধা হয় 'দীর্ঘ-ত্রিপদী'। চৌপদীতে থাকে ৮+৮+৮+৮ ব্যষ্টি, তার চতুর্থ পদে দুই ব্যষ্টি অধিক হ'লে তার অভিধা হবে 'দীর্ঘ-চৌপদী'। অক্ষরবৃত্ত রীতির দীর্ঘ-ত্রিপদীতে ৮+৮+১০ অক্ষর থাকে; সুতরাং যথা-বিধি দীর্ঘ-চৌপদীতে ৮+৮+৮+১০ অক্ষর থাকে। কিন্তু সুনীতিকুমারের সংজ্ঞা: 'দীর্ঘ চৌপদী—৮+৮+৮+৮; শেষ চরণ ৭, ৬ বা ৫ অক্ষরেরও হয়।''৩৩ অনেক ছন্দজ্ঞ পণ্ডিতের মতো বহুভাষাবিদ বিশ্ববিশ্রুত বৈয়াকরণ সুনীতিকুমারও এ-ব্যাপারে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত গোত্রের 'পজ্ঝটিকা' ছন্দে ''প্রতি পদ যমকিত ষোড়শ মাত্রা, নবম গুরুত্ব-বিভূষিত গাত্রা''; তাতে একটিও 'মধ্যগুরু' জ-গণ (v—v) থাকে না (ক্বাপি একঃ মধ্যগুরুর্গণ জগণঃ ন স্যাৎ)। কিন্তু প্রাকৃত পাদাকুলক রীতিতে নবম মাত্রা 'গুরুত্ব-বিভূষিত' না হ'লেও চলে এবং তাতে বর্ণের নির্দিষ্ট লঘু-গুরু ভেদ প্রায়শঃ বিশ্লথ। পজ্-ঝটিকার সঙ্গে পাদাকুলকের এই-ই পার্থক্য। সুনীতিকুমার ''সংস্কৃতের মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অনুসারী পজ্ঝটিকা'' ছন্দের নমুনা-স্বরূপ আটটি পঙ্‌ক্তি পরিবেশন করেছেন; কিন্তু তাতে পঙ্‌ক্তিক্রমে ১৪, ১৬, ২০, ১৮, ১৮, ১৬, ১৯ ও ১৬ মাত্রা রয়েছে। নিম্নে তা থেকে প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তি সংকলন করছি:

VVV VV VV VV V— —
প্রভুর সহ ভ্রমি গিরি অরণ্যে
VVV VV VV VV— V ——
লভিনু সুখ যত বুঝিবে কি অন্যে।
VV — —V — — V—V V — —
কভু বা দেখি মোরা নদীজল-বক্ষে
—VV V— —V —— ——
নূতন নভে চাঁদ জ্যোৎস্না পক্ষে।

তাঁর পরিবেশিত আটটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে মাত্র তিনটি পঙ্‌ক্তি পাদাকুলক পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ হয়। নিখুঁত পাদাকুলক হ'বে নিম্নরূপ:

— —V —V V —V V V V V
ধামার্থ চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
—V—V — V —V V VVV
পারগামি লোঅ নীভর ভরই॥
—(চর্যা: ৫)

[ধর্মার্থে চাটিলপাদ সাঁকো গড়ে;
পারগামী লোক তাতে নির্ভর ক'রে ত্রাণলাভ করে।]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'Buddists Mystic Songs' পুস্তকে ছন্দসমতা বিধানের উদ্দেশ্যে মূল পাঠ 'নিভর' স্থানে 'নীভর' ক'রে ১৬-মাত্রা পূর্ণ করেছেন। সুনীতিকুমার উক্ত 'নীভর' পাঠ গ্রহণ করেছেন; কিন্তু তাঁর উদ্ধৃত মূল পাঠের 'ধার্মার্থে' স্থানে 'ধার্মার্থ'

না হ'লে পঙ্‌ক্তির মাত্রা-সংখ্যা ১৭ হয়ে পাদাকুলক রীতি অপহৃত হয়। নিম্নে আধুনিক কালে খাঁটি বাঙ্‌লায় বিরচিত নিখুঁত পজ্‌ঝটিকার নমুনা তুলছি :

V V—V V — —V V ——
হৃদি-মন্দির যে বন্ধন যাচে
—V V— V V —V V ——
নাহি মিলে সুখ সঙ্গম মাঝে।
—(দিলীপকুমার রায়, সূর্যমুখী, 'সুখ-সঙ্গম')

এখানে দু'টি পঙ্‌ক্তিতেই নবম মাত্রা 'গুরুত্ব-বিভূষিত',—'বন্ধন' শব্দের 'বন্‌' ও 'সঙ্গম' শব্দের 'সঙ্' গুরু অর্থাৎ দ্বিমাত্রক। এখানে কোনো 'মধ্যগুরুর্গণঃ' নেই। তাই এই শ্লোকটি ৪+৪+৪+৪ মাত্রা-ভাগের আদর্শ পজ্‌ঝটিকা।

সুনীতিকুমারের 'সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' 'নবীন সংশোধিত সংস্করণ' ১৯৭২ ডিসেম্বরে আত্মপ্রকাশ করে। এ-গ্রন্থের শেষাংশে 'অলঙ্কার' বিভাগে 'অনুপ্রাস', 'যমক', 'শ্লেষ', 'উপমা', 'রূপক', 'উৎপ্রেক্ষা', 'ব্যতিরেক' এবং 'সমাসোক্তি' বিষয়ের বর্ণনা আছে; কিন্তু গ্রন্থখানিতে ছন্দঃপ্রকরণ পরিবর্জিত হয়েছে। সুনীতিকুমার ও তাঁর 'গবেষণা-সহায়ক' অনিলকুমার কাঞ্জিলাল-কৃত 'মধ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এবং সংশোধিত সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৬ এপ্রিলে সম্পন্ন হয়। গ্রন্থখানির সূচনাংশে 'ধ্বনি ও বর্ণ' অধ্যায়ের 'সন্ধি-স্বর' বিভাগে বলা হয়েছে :

> বাঙ্গালাতে দুইটি ভিন্ন স্বরধ্বনির সমবায়ে সন্ধি-স্বর বা সন্ধ্যক্ষরের উদ্ভব হয়; তন্মধ্যে মাত্র দুইটির জন্য বিশেষ বর্ণ বাঙ্গালা বর্ণমালায় মিলে; 'ঐ' (=ওই), 'ঔ' (=ওউ)।

এ-প্রসঙ্গে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন :

> 'অ' 'ই' 'উ' ইহাদের পরস্পর সন্ধিতে সন্ধ্যক্ষর কয়টি উৎপন্ন হয়; যথা :
>
> অ+ই=এ অ+এ=ঐ
> অ+উ=ও অ+ও=ঔ
>
> সংস্কৃত ভাষায় এই চারিটি স্বর স্বভাবতঃ দীর্ঘ; উহাদের হ্রস্ব উচ্চারণ নাই। বাঙ্গালায় এ-কারের এবং ও-কারের হ্রস্ব উচ্চারণই প্রসিদ্ধ।
>
> 'য়' (y) 'ব' (w) 'র' 'ল' এই চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণকে উল্টা রকমের সন্ধ্যক্ষর-রূপে গণ্য করা চলতে পারে :
>
> য়=ই+অ ব=উ+অ
> র=ঋ+অ ল=ঌ+অ

> উহাদের উচ্চারণে মুখ সম্পূর্ণভাবে বিবৃতও থাকে না, আবার হাওয়া একেবারে আটকানও পড়ে না। কাজেই উহারা না-স্বর না-ব্যঞ্জন। ইংরেজিতে y ও w পদমধ্যবর্তী হইলে Vowel বলিয়াই গণ্য হয়।[৩৪]

এখানে 'ঐ' এবং 'ঔ' এই দু'টি সন্ধ্যক্ষরের (diphthong) প্রভব ও উচ্চারণ-ভঙ্গী সম্পর্কে সুনীতিকুমার ও রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয় না কি ? রামেন্দ্রসুন্দর "ব=উ+অ" বলেন। আর প্রবোধচন্দ্র বলেন: "বাংলা বর্ণমালা থেকে যথার্থ অন্তঃস্থ য় (ya) লুপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের উচ্চারণে যখনই যথার্থ অন্তঃস্থ য়-র আবির্ভাব হয় তখনই তাকে লিখতে হয় 'ইয়' রূপে। ... অন্তঃস্থ ব (=wa), —রূপটি হচ্ছে 'ওয়'। 'ওয়া' ধ্বনির মধ্যে অন্তঃস্থ ব লুকিয়ে রয়েছে।"[৩৫] অন্তঃস্থ ব-ধ্বনির বিষয়েও রামেন্দ্রসুন্দর ও প্রবোধচন্দ্রের উচ্চারণ-ভঙ্গীর মধ্যে বেশ ভিন্নতা প্রতীয়মান হয় না কি ?

প্রবোধচন্দ্র তাঁর 'আধুনিক বাংলা ছন্দ-সাহিত্য' পুস্তকে রাজশেখর বসুর ছন্দ-বিষয়ক অভিমতসমূহ প্রভূত শ্রদ্ধা-সহযোগে প্রত্যবেক্ষণ করেছেন। রাজশেখর বসু ১৩৪৯ কার্তিকের বিশ্বভারতী পত্রিকায় 'বাঙলা ছন্দের মাত্রা' শীর্ষনামে যে-প্রবন্ধ লেখেন, তাতে তিনি তাঁর 'চলনসই কর্ণেন্দ্রিয়' দিয়ে বাংলা ছন্দসমূহের বহুলাংশে বিজ্ঞানসিদ্ধ বিচার করেছেন, এবং স্বর ও অক্ষর প্রসঙ্গে 'স্বতোদীর্ঘ', 'পরতোদীর্ঘ', 'স্বতোগুরু', 'পরতো-গুরু', 'কৃত্রিম গুরু' প্রভৃতি বিবিধ অদ্ভুত পরিভাষা প্রয়োগ ও অক্ষর-গণনার রকমারি বিচিত্র ছক তৈরী করেছেন। ১৩৫২ কার্তিকের 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত রাজশেখর বসুর ছন্দবিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'বাংলা ছন্দের শ্রেণী' তাঁর 'লঘুগুরু' নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; অথচ তাঁর "অপেক্ষাকৃত বড় ও সযত্নলিখিত প্রথম প্রবন্ধটি (বাংলা ছন্দের মাত্রা) গ্রন্থভুক্ত হবার যোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়নি, তার কারণ কি ?"—এই প্রশ্ন আন্তরিকতা-সহকারে উত্থাপন করেছেন প্রবোধচন্দ্র।[৩৬] অথচ তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার রায় যথেষ্ট সংযম সহকারে অথচ সুতীক্ষ্ণ ভাষায় উক্তি 'বাংলা ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধটির সুকঠোর সমালোচনা করেন তাঁর 'বাংলা ছন্দের যৎকিঞ্চিৎ' নামক লেখাটিতে। তাতে দিলীপকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলেন:

> "মনে হয়, ছন্দ সম্বন্ধে আর-একটু চর্চা ক'রে তবেই এ-সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচারে অগ্রসর হ'লে ভালো করতেন তিনি"[৩৭] —অর্থাৎ রাজশেখর বসু।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছন্দশাস্ত্রী দিলীপকুমারের এ-রূপ যুক্তিনিষ্ঠ পরামর্শই রাজশেখর বসুকে উক্ত বিতর্কিত প্রবন্ধটির গ্রন্থভুক্তিতে বিরক্তির বা নিরাসক্তির প্ররোচনা দিয়েছিল; এ-রকম অনুমান করা চলে না কি ?

রাজশেখর বসু তাঁর 'বাংলা ছন্দের শ্রেণী' নামের প্রবন্ধে 'স্থিরমাত্র' ছন্দ, 'অস্থির মাত্র প্রসারক' ছন্দ ও 'অস্থিরমাত্র সংকোচক' ছন্দ, এই তিনটি আখ্যা যথাক্রমে নির্দেশ

করেছেন প্রচলিত মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের স্থলে। একটা সংস্কৃত প্রবচন : ''নাসৌ মুনির্ষগ্য মতং ন ভিন্নম্'' : ''ভিন্ন মত পোষণ না করাটাই যেন অগৌরবের।'' মনে হয়, বাংলা ভাষার আধুনিক ছন্দজ্ঞগণ নূতন নূতন উৎকট ও উদ্ভট ছন্দ-পরিভাষা তৈরী করাটাই যেন তাঁদের মর্যাদা, স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রশস্ত পথ ভেবেছেন; তাই 'স্বতোদীর্ঘ', 'পরতোগুরু', 'সঙ্কোচক ছন্দ', 'প্রসারক দলবৃত্ত', 'বিশিষ্ট কলামাত্রিক', 'পাদকমাত্রিক', 'যৌগিক মাত্রিক', 'শুদ্ধ প্রাকৃত', 'ভঙ্গ প্রাকৃত', 'সঙ্কোচ-প্রধান ছন্দ', 'বিস্তার-প্রধান ছন্দ', 'শব্দাণু ছন্দ', 'অতিক্রান্ত-যতি', 'গ্রন্থন-যতি', 'যমন ব্যষ্টি', 'পরাগত ক্রম' প্রভৃতি বহুবিধ শ্রুতিকঠোর পরিভাষা (terminology) উদ্ভাবনে উৎসাহী হয়েছেন!

প্রবোধচন্দ্র তাঁর 'আধুনিক বাংলা ছন্দ-সাহিত্য' গ্রন্থে বিশ্রুতকীর্তি কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বহু-সমাদৃত কিশোর-পাঠ্য 'কবিতার ক্লাস' পুস্তকটির বিস্তারিত পর্যালোচনা ও যথাযোগ্য প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর 'বাংলা ছন্দ-সাহিত্য' শিরোনামীয় প্রবন্ধে (আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৮০) উক্ত পুস্তকখানির বিষয়ে আলোচনার শেষ অনুচ্ছেদে এবং 'বাংলা ছন্দে মাত্রা-গণনা' নামক প্রবন্ধে (কথাসাহিত্য, কার্তিক ১৩৮৩) যে-সকল প্রতিকূল মন্তব্য করেছিলেন, তার অনেকাংশই তাঁর গ্রন্থে পরিত্যক্ত হয়েছে।

কবি বুদ্ধদেব বসু ১৩৪৭ পৌষের 'কবিতা' পত্রিকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' কাব্যের যে-'সুদীর্ঘ সমালোচনা' লেখেন, সে-সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র ১৩৪৮ ফাল্গুনের 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা' নামধেয় প্রবন্ধে অনেক অকাট্য যুক্তি-তত্ত্ব সংযোগে মূল্যবহ মন্তব্য রাখেন। প্রবোধচন্দ্র ঠিকই বলেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ''বইখানিতে ছন্দরচনার দক্ষতা থাকলেও ছন্দোবৈচিত্র্যের অভাব চোখে পড়ে।'' সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাঙলা ছন্দ নিয়ে ''নানা রকম দুঃসাহসী পরীক্ষায়'' বা ''নূতন ধ্বনি অন্বেষণের দিকে'' সচেতনভাবে অগ্রসর হন, বুদ্ধদেব বসুর এই ধারণা বাস্তবিকই ভ্রমাত্মক। কাজী নজরুল ইসলাম বহু পূর্বে লিখেছিলেন :

বিপুল আমার বিত্ত বিপুল যশ গৌরব,
নিষ্প্রভ আজি করেছে তাহারে তোমার বিভব।
—(মরু-ভাস্কর, 'খদিজা')

এখানে ৬+৬+৬ মাত্রা-যোগে পঙ্‌ক্তি গঠিত। এই রীতিতেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'চীন : ১৯৩৮' এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'প্রস্তুত' (ছাড়পত্র) ও 'বিভীষণের প্রতি' রচনা করেন।

বেদনার পর বেদনা হানিয়া তাই তা'রে
ভিখারী সাজায়ে পাঠালো বিশ্ব-দরবারে।
—(মরু-ভাস্কর, 'সর্বহারা')

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কানামাছির গান: ১' এরূপ ৬+৬+৪ মাত্রাভাগে বিরচিত। সোঁদা কথা, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কোনো নূতন ছন্দরীতি বা ছন্দোবন্ধ উদ্ভাবন করেননি। প্রবোধচন্দ্রের এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত নবীন ছন্দ-পড়ুয়াদের নজর খুলে দিবে, সন্দেহ নেই।

১৩২৮ কার্তিকের 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি মুক্তবন্ধ ষন্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে বিরচিত। নজরুল বাঙলা কবিতায় মুক্তক মাত্রাবৃত্ত রীতির প্রবর্তক। প্রবোধচন্দ্র মন্তব্য করেন :

> "বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মুক্তবন্ধ কবিতার অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলার উদীয়মান কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।"৩৮

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটির ছন্দের অভিনবত্ব বিষয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন সদাজাগ্রত-দৃষ্টি মনীষা প্রবোধচন্দ্র।

শ্রী অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম. এ., পি. আর. এস. মহোদয় তাঁর 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' পুস্তকে (২য় সংস্করণ, ১৯৪০) 'বাংলা ছন্দে জাতিভেদ' অধ্যায়ে "১৩২৩ সনে দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে স্বর্গীয় রাখালরাজ রায় মহাশয়" কর্তৃক পঠিত 'প্রবন্ধ' থেকে পাঁচটি বাক্য উদ্ধৃত করেন; কিন্তু তাতে উক্ত প্রবন্ধের শীর্ষনাম এবং তার প্রকাশ-স্থলের উল্লেখ নেই। ডক্টর শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য এম. এ., ডি. লিট্., পি. আর.এস্. মহোদয় তাঁর 'বঙ্গীয় ছন্দোমীমাংসা' প্রথম খণ্ডের (১৯৪৩) ৯ ও ১০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় শ্রীরাখালরাজ রায়ের 'বাঙ্গলার ছন্দ ও তাল' প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা ১৩২৩ সালে বাঁকিপুর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনে' পঠিত এবং ১৩২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা : ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা 'পরিচারিকা' পত্রিকায় 'প্রকাশিত' ব'লে উল্লেখ করেন। 'পয়ারোৎপত্তি-ব্যাখ্যা' সম্পর্কে তিনি তাঁর উক্ত পুস্তকের ১১৫ পৃষ্ঠায় রাখালরাজ রায়ের অভিমত উদ্ধৃত ক'রে তা 'বিজ্ঞান-বিরোধী বহু কাল্পনিকতার আশ্রয়' ব'লে সেই 'মতবাদ পরিত্যাজ্য' প্রতিপন্ন করেন। শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' পুস্তকের (২৯ এপ্রিল ১৯৭৪) পরিশিষ্টে উক্ত 'বাঙ্গলার ছন্দ ও তাল' প্রবন্ধটি সংকলিত ক'রে ছন্দঃকুতূহলী পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

শ্রী তারাপদ ভট্টাচার্য তাঁর উপরোক্ত পুস্তকের ৮ পৃষ্ঠায় বলেন যে, ১২৯৯ আশ্বিনে ৩য় বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যক 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'ঘন-শ্যাম দাস' নামক প্রবন্ধ পাঠে বৈষ্ণব কবি নরহরি চক্রবর্তীর 'ছন্দঃসমুদ্র' গ্রন্থের কথা জানা যায়; কিন্তু "এ গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য"। ডক্টর শ্রী আনন্দমোহন বসুর 'বাংলা পদাবলীর ছন্দ' গ্রন্থের (জুলাই ১৯৬৮) 'নান্দীবচন'-এ শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন "অষ্টাদশ শতকের কবি-ছান্দসিক নরহরি চক্রবর্তী ওরফে ঘনশ্যাম দাসের 'ছন্দঃসমুদ্র' গ্রন্থখানি" সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করেন। হরিদাস দাস মহাশয়ের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য' পুস্তকের

(১৯১৯ খ্রী.) ২১৩-১৫ পৃষ্ঠায় 'ছন্দঃসমুদ্র' গ্রন্থের "প্রথম দিকের একটু অংশ মাত্র মুদ্রিত হয়েছে।" তাঁর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' গ্রন্থে (১৯৫৮ খ্রী.) উক্ত 'একটু অংশ'-সহ 'ছন্দঃসমুদ্র' গ্রন্থের 'প্রথম তরঙ্গ সম্পূর্ণ' এবং 'দ্বিতীয় তরঙ্গের কিছু অংশ' স্থানলাভ করে। তা থেকে 'ছন্দঃসমুদ্র' পুস্তকের প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় অংশসমূহ প্রবোধচন্দ্র তাঁর 'বাংলা ছন্দচিন্তার ক্রমঃবিকাশ' গ্রন্থের (২৯ এপ্রিল ১৯৭৮) 'অনুষঙ্গ'-বিভাগে 'সংকলন' ক'রে দিয়েছেন। এই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তার বিকাশ-বিষয়ে একটা যথাসম্ভব ধারাবাহিক বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে সুবলিত ভাষায়।

রেভা. জে. লঙ্ ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর রচিত 'A Descriptive Catalogue of Bengali Works'-এ বিগত ষাট বৎসরে মুদ্রিত চৌদ্দ শত বাংলা পুস্তক ও পুস্তিকার শ্রেণীবিভাগানুযায়ী তালিকা লিপিবদ্ধ করেন। সেই ক্যাটালগের Grammar বিভাগে বলা হয় যে, নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড (১৭৫১-১৮৩০) প্রথম বাংলা ব্যাকরণ 'A Grammar of Bengalee language' (১৭৭৮) প্রণয়ন করেন। সেই ব্যাকরণে ছন্দঃপ্রকরণ (on versification : of the formation of verses) পরিচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। সেই পরিচ্ছেদটিও প্রবোধচন্দ্র তাঁর 'বাংলা ছন্দচিন্তার ক্রমঃবিকাশ' পুস্তকের পরিশিষ্টে পরিবেশন করেছেন। তাঁর এ-সকল সংকলন বাংলা ছন্দ-সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে, সন্দেহ নেই।

পাদ্রী লঙ্ সাহেবের ক্যাটালগে বলা হয়েছে যে, ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে নন্দকুমারের 'ব্যাকরণ দর্পণ' বেঙ্গল সোসাইটি ৫০০ কপি মুদ্রিত করেন; সেটি 'মুগ্ধবোধ ছন্দমঞ্জরী' থেকে উপকরণ নিয়ে ইংরেজী ব্যাকরণের আদর্শে বিরচিত; তাতে ছন্দরীতি (versification) বিষয়ে পদ্যে আলোচনা আছে। লঙ্ সাহেবের ক্যাটালগে আরও কথিত হয়েছে যে, ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত শ্যামাচরণের ৪০৮ পৃষ্ঠার 'এংলো-বেঙ্গলী গ্রামার'-এ শুধু ব্যাকরণ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ নয়, তাতে বাংলা কবিতার ছন্দ বিষয়েও প্রচুর তথ্য (much information besides on the prosody of bengali poetry) রয়েছে। শ্যামাচরণের 'বাংলা ব্যাকরণ' (১৮৫২), ইংরেজী গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ—উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী সুন্দর গ্রন্থ। লঙ্ সাহেব এই বিভাগের তালিকা শেষ করেছেন 'Wencer's Bengali Grammar' গ্রন্থটির উল্লেখ ক'রে। তিনি বলেছেন যে, Wencer-এর 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' খুব সহজ; তাতে বাক্যবিন্যাস ও ছন্দশাস্ত্র বিষয়ে দুটি সুন্দর অধ্যায় (two good chapters on syntax and prosody) আছে। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৬, মূল্য পাঁচ সিকা, প্রকাশক : স্কুল বুক সোসাইটী। প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর "সিলেবল্-কে অক্ষর বলি না কেন" প্রবন্ধের গোড়ার দিকে শ্যামাচরণ শর্মণঃ সরকার বিদ্যানিধি (১৮১৪-৮২) প্রণীত 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' (১৮৫২), পাদরী জে: ওয়েঙ্গার কর্তৃক সম্পাদিত 'Introduction to the Bengalee Language' (১৮৫০) ও 'Bengali Grammar' (১৮৪৯) প্রভৃতি থেকে তাঁর বক্তব্যের অনুকূল উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

লঙ্ সাহেবের কথিত Wencer এবং প্রবোধচন্দ্রের উল্লেখিত পাদ্রী জে. ওয়েঙ্গার কি অভিন্ন ব্যক্তি? কোনো নবীন গবেষক যদি নন্দকুমারের 'ব্যাকরণ-দর্পণ', শ্যামাচরণ শর্মার 'বাংলা ব্যাকরণ' এবং Wencer সাহেবের 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' থেকে তাদের ছন্দ-পরিচ্ছেদগুলি সম্পূর্ণ উদ্ধার ক'রে এ-কালের কাব্যরসপিপাসু পাঠকদের সামনে উপহার দেন, তা হ'লে বাংলা ছন্দ-সাহিত্যের সম্পদ পরিপুষ্ট হ'বে, সন্দেহ নেই।

ছন্দ হচ্ছে বাক্‌ভঙ্গীর শিল্পিত রূপ: "সূক্ষ্মতম রসের একটি অসামান্য রসদদার।" ছন্দ শুধু কবিতার ধ্বনিমাধুর্য প্রবৃদ্ধি ও স্বরসৌষম্য সংসাধন করে না, কাব্যপ্রিয় পাঠকের রস-চেতনাকেও করে অনুপ্রাণিত। ছন্দের এই দুর্বিজ্ঞেয় লীলা-রহস্য আবিষ্কার ও শ্রুতি-গত স্বরূপ নিরূপন ছান্দসিকের কাজ। প্রবোধচন্দ্র এই দুরূহ অথচ আনন্দময় কাজে জীবনের সুদীর্ঘ ষাট বৎসর নিয়োজিত রেখে বাংলা ছন্দের অনেক জটিল প্রশ্নের গ্রন্থি-মোচন করেছেন; তাঁর নিরলস সাধনায় ও অনুপুঙ্খ পর্যেষণায় বাংলা ছন্দতত্ত্ব আজ একটা প্রণালীবদ্ধ রূপ পেতে চলেছে। তিনি এই দুষ্কর কাজে তাঁর প্রতি আমার ন্যায় অনুজ অনুরাগীদের সর্বদা সানন্দে দিয়েছেন উৎসাহ ও উৎপ্রেরণা; ফলে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে অধুনা একটা ছান্দসিক-মণ্ডলী গ'ড়ে উঠেছে। তিনি তাঁর বয়োকনিষ্ঠ লেখকদের ছন্দালোচনায় কোনো স্বীকৃতিযোগ্য নূতন মন্তব্য দেখলে তার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেন; তাঁর এই উদার ও অন্তরস্পর্শী গুণগ্রাহিতা তাঁর নিরভিমান চরিত্রের একটা মহৎ বৈশিষ্ট্য। (তাঁর বন্ধু ও দূরাত্মীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনেও এরূপ দুরবগ্রহ মাহাত্ম্য আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি।) এ-সকল অতুলন গুণ, কীর্তি ও কৃতিত্বের জন্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে নিঃসংশয়ে তাঁর লাভ হবে অবিস্মরণীয় অমর আসন।

তথ্যনির্দেশ

১ বাংলার তিন মূল ছন্দের এই আকৃতিগত শ্রেণীবিভাগের সাফাই-স্বরূপ ১৩২১ সালে জে. ডি. এণ্ডার্সন-কে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

> "বাংলা ছন্দকে সম মাত্রা, অসম মাত্রা এবং বিষম মাত্রায় শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। শুধু বাংলা কেন, কোনো ভাষার ছন্দের আর-কোনো প্রকার ভাগ হইতে পারে বলিয়া মনে করিতে পারি না।"—(রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৪০৪)।

২ 'সঙ্গীতের মুক্তি', সবুজপত্র, ভাদ্র ১৩২৪ সন।

৩ 'বাংলা ছন্দ ও সঙ্গীত', প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩০ সন, পৃ. ৭৯১

৪ 'বাংলা ছন্দের বিবর্তন', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ভাদ্র ১৩৩৮ সন।

৫ 'বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ', বিচিত্রা, ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৫৭২

৬ ছন্দ-জিজ্ঞাসা, পৃ, ২৪৬

৭ 'ছন্দ-সংকট' প্রবন্ধ, উত্তরা, ১৩৩৯ ভাদ্র।

৮ 'ছন্দ-অঙ্গন' শীর্ষক পত্রাংশ। স্বদেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪১ সন, পৃ. ৩৪১

৯ 'বাংলা ছন্দ', প্রবাসী, ১৩২৯ মাঘ।

১০ 'যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনি', বিচিত্রা, ১৩৪২ আষাঢ়, পৃ. ৭৪৪

১১ বিচিত্রা, ১৩৩৯ বৈশাখ। ছন্দ-জিজ্ঞাসা, পৃ. ২৫৩

১২ নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড (১৭৫১-১৮৩০ খ্রী.) কর্তৃক সংগৃহীত ও বৃটিশ লাইব্রেরীর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত সুখময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ, ১৯৮০ ডিসেম্বর।

১৩ প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ছন্দের শ্রেণীবিভাগ' প্রবন্ধে লাতিন Epiritus Quartus প্রণালীর অনুসরণে স্বরবৃত্তের পর্যায়ক্রমিক প্রাস্বরিক প্রক্রিয়ায় প্রণয়ন করেছেন: "নয় নয় হিংসা, রক্তের বন্যা, / প্রাণহীন বিশ্বে করতেই ধন্যা" ইত্যাদি; কিন্তু এই অভিনব ছন্দোবন্ধ বাঙলা ভাষাতেও বিকাশ লাভ করেনি।

১৪ ছন্দ-সরস্বতী, পঞ্চম প্রকাশ, ভারতী, ১৩২৫ বৈশাখ।

১৫ ছন্দ-পরিক্রমা, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৪৯

১৬ ছন্দ-পরিক্রমা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৪ ভাদ্র, পৃ. ১৬৫-৬৭

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

১৮ শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত 'বৈষ্ণব-পদলহরী', পৃ. ৩২৬

১৯ বাঙলা প্রস্বরমাত্রিক প্রক্রিয়ায় এর পদ্যানুবাদ:

— — -- — v v v v v — —v v • • v — —
বর্ষাভ্রের রূপ——যেন গো দু'টি গজ বপ্ররঙ্গেই নিতুই লীন,
সেই মেঘ অদ্রির ঘিরিল সানুদেশ, মাস আষাঢ়, তার প্রথম দিন॥
—(যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার, মেঘদূত, পূর্বমেঘ : ২)

২০ পিঙ্গলচ্ছন্দঃ সূত্রম, ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ, যতিবিচ্ছেদ॥

২১ ছন্দ-পরিক্রমা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৮২

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

২৩ ছান্দসিকী, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৫১-৫৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৫৩-৫৫

২৪ ছন্দ-পরিক্রমা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১২৯-৩১

২৫ রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'আহ্বান' কবিতায়:

পথে কোথাও, জনপ্রাণী নেই,
ঘরে ঘরে সবাই ঘুমিয়ে আছে।
মা তোর শুধু একলা দ্বারে বসে'
চুপি চুপি আয় মা মায়ের কাছে॥

এখানে 'সবাই ঘুমিয়ে' পর্ব পাঁচ-স্বর হ'য়ে ছন্দে শৈথিল্য (latitude) ঘটিয়েছে। এ-রকম অনিয়ম 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের বহু স্বরবৃত্ত কবিতায় লক্ষিতব্য। এখানে 'ঘুমিয়ে' শব্দের প্রান্তিক 'য়ে' এবং পরবর্তী 'আছে' শব্দের 'আ' সংযুক্ত হয়ে যৌগিক স্বরবর্ণ (diphthong) হওয়ায় তার ধ্বনিমূল্য হয়েছে দ্বিমাত্রক,— একস্বর (monophthong) হ'লে ধ্বনিমূল্য হ'তো একমাত্রক। এর আর-একটা দৃষ্টান্ত তুলছি :

বেড়ার মধ্যে একটি আমের গাছে
গম্ভীরতায় আসর জমিয়ে আছে।
—(ছড়ার ছবি, 'তালগাছ')

এখানে 'জমিয়ে' শব্দের 'য়ে' এবং 'আছে' শব্দের 'আ' মিলে "য়ে আ=এ্যা" হ'লে তাকে কি একটি স্বরধ্বনি (synoezesis) বলা বিধেয় হবে? না, অদৃঢ় সংযোগের ফলে তা যৌগিক স্বর (diphthong)? 'এ্যা' স্বরসন্ধি বা সন্ধ্যক্ষর হ'লে 'আসর জমিয়ে' পর্ব পাঁচ-স্বর হ'য়ে ছন্দ শ্লথ হয় না কি?

২৬ 'যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনি', বিচিত্রা, ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৬১৬

২৭ শ্রী অনাথকৃষ্ণ দেব-প্রণীত 'বঙ্গের কবিতা' দ্বিতীয় ভাগ (১৩১৮) ৬১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২৮ তুলনীয় :

নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝঅ।
ঢেণ্টণ পাএর গীত বিরলেঁ বুঝঅ॥
—(চর্যা : ৩১)

২৯ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৪৫ জানুআরি, পৃ. ৩৮১

৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭

৩১ কাব্যনির্ণয়, নবম সংস্করণ, ১৩৪২ শ্রাবণ, পৃ. ৯৫

৩২ পূর্বোক্ত, 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'; পৃ. ৩৮৭-৮৯

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

৩৪ শব্দ-কথা, ধ্বনি-বিচার, পৃ. ১২ ও ১৫

৩৫ ছন্দ-পরিক্রমা, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৪৭-৪৯

৩৬ আধুনিক বাংলা ছন্দ-সাহিত্য, পৃ. ২১৩

৩৭ 'বাংলা ছন্দের যৎকিঞ্চিৎ', মন্দিরা, ১৩৫০ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৮৩

৩৮ 'মাত্রাবৃত্ত ছন্দ', প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩০ সন।